মহান ঘটনা থেকে ভাল চরিত্রের পাঠ

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية
يؤدي إلى راحة البال

মহান ঘটনা থেকে ভাল চরিত্রের পাঠ

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2024 দ্বারা প্রকাশিত

নোবেল চরিত্রের উপর দুর্দান্ত ঘটনা

দ্বিতীয় সংস্করণ। 9 মার্চ, 2024।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে।

ভূমিকা

নিম্নলিখিত বইটিতে ইতিহাসের কিছু মহান ঘটনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা কিছু ভাল বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে যেগুলি মুসলমানদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং কিছু খারাপ বৈশিষ্ট্য তাদের এড়িয়ে চলতে হবে যাতে তারা মহৎ চরিত্র অর্জন করতে পারে।

ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়

জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 4 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

মহান ঘটনা থেকে ভাল চরিত্রের পাঠ

মানবজাতির উদ্দেশ্য

আল্লাহ, মহান, মানুষের সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ 40 গাফির, 67 নং আয়াতে:

“তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর জমাট বাঁধা থেকে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করে আনেন। তারপর [তিনি আপনাকে বিকাশ করেন] যে আপনি আপনার [সময়ের] পরিপক্কতায় পৌঁছান, তারপর [আরও] আপনি বয়স্ক হন। আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যাকে [তার] পূর্বেই মৃত্যুবরণ করা হবে, যাতে তোমরা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে উপনীত হও। এবং সম্ভবত আপনি যুক্তি ব্যবহার করবেন।"

পবিত্র কোরান 51 অধ্যায়ে আধ ধরিয়াত, 56 নং আয়াতে মানবজাতির উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত ছাড়া সৃষ্টি করিনি।"

কেউ মহান আল্লাহর ইবাদত করার আগে, প্রথমে তাকে চিনতে হবে , কারণ জ্ঞান ছাড়া কারো আনুগত্য করা সম্ভব নয়। উপরন্তু, মানুষকে প্রথমে শিখতে হবে কিভাবে তারা এই কাজটি সম্পন্ন করার আগে মহান আল্লাহর ইবাদত

করতে হয়। তাই জ্ঞানের অনুসরণে পূজা হয় । এ কারণেই সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরকারী জ্ঞান অন্বেষণকে সকল মুসলমানের জন্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছেন। জ্ঞান ছাড়া কেউ কখনই মহান আল্লাহর ইবাদত সঠিকভাবে করতে পারবে না। জ্ঞানের সাথে সম্পাদিত কিছু ভাল কাজ অজ্ঞতার কারণে ভুলভাবে করা অনেক ভাল কাজের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত।

যেহেতু মহান আল্লাহ, তিনিই মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি ছাড়া আর কারো সেবা ও উপাসনা করার অধিকার নেই। একজন নিয়োগকর্তা যদি তাদের কর্মচারীকে যে দায়িত্বের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে তা পরিত্যাগ করার জন্য সহজেই বরখাস্ত করে, তবে মহান আল্লাহর দাসত্ব ও ইবাদত ত্যাগ করা কীভাবে সঠিক হবে, যখন তিনি একাই সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন এবং টিকিয়ে রেখেছেন? সমস্ত মানবজাতিকে স্বাধীন ইচ্ছা এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য ও উপাসনা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তিনি সাধ্যের বাইরে কিছু আদেশ করেন না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

তাই প্রতিটি ব্যক্তিকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে চায়, যার ফলে উভয় জগতেই মন ও শরীরের শান্তি পাওয়া যায়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অথবা তারা তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে এবং উভয় জগতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

যেভাবে একটি মোবাইল ফোনের মতো একটি ডিভাইস, যেটি তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য পূরণ করে না তা বাতিল করা হয়, মানুষ তাদের অস্তিত্বের প্রাথমিক উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে এই পৃথিবীতে এবং বিচারের দিন জাহান্নামে পরিত্যাগ করা হবে।

উল্লেখ্য, ইবাদত বলতে মহান আল্লাহর আনুগত্য বোঝায়। এর মধ্যে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত। এই আনুগত্য তাই একজনের জীবন

এবং শরীরের প্রতিটি অংশকে ঘিরে রাখে, যেমন তাদের জিহ্বা। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহর প্রতি একজন ব্যক্তির কর্তব্য, যেমন নামায পড়া, এবং সৃষ্টির অধিকার পূরণ করা, যেমন অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা যেমন একজন ব্যক্তি মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়।

যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তারা সর্বোত্তম পুরস্কার পাবে এবং যারা তাঁর অবাধ্য হবে তারা দুনিয়া ও আখেরাতের সবচেয়ে খারাপ শাস্তি পাবে। জামে আত তিরমিযী, 2466 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদীসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মহান আল্লাহর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি ঘোষণা করেছেন যে কেউ যদি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর ইবাদতে নিজেকে ব্যস্ত রাখে তবে তিনি পূর্ণ করবেন। তাদের হৃদয় সমৃদ্ধি এবং তাদের দারিদ্র্য দূর করুন। কিন্তু যদি তারা তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে মহান আল্লাহ তাদের জীবনকে সমস্যায় পূর্ণ করবেন এবং তাদের দারিদ্র্য দূর করবেন না।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহ কোনভাবেই সৃষ্টির প্রয়োজন করেন না। সহীহ মুসলিম, 6572 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, লোকেরা কেবল তাদের ভাল কাজের দ্বারা নিজেদের উপকৃত হয়, কারণ এটি তাদের পদমর্যাদা বাড়ায়। এবং তারা কেবল তাদের পাপের সাথে নিজেদের ক্ষতি করে, কারণ তাদের জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে। মহান আল্লাহর অসীম মর্যাদা মোটেও পরিবর্তিত হয় না, সমগ্র সৃষ্টি তাঁর ইবাদত করুক বা না করুক না কেন। মহান আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং একমাত্র রিযিকদাতা। এটা মানুষ যারা সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁর প্রয়োজন. যে ব্যক্তি এটি বুঝতে পারে এবং আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, সে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করবে এবং তাই উভয় জগতেই তাকে মানসিক ও দেহের শান্তি দেওয়া হবে।

হযরত আদম (আ.)

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে তা হল যখন ফেরেশতাদের হুকুম দেওয়া হয়েছিল হযরত আদম (আঃ) কে সিজদা করার জন্য। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 34:

"আর [উল্লেখ করুন] যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, আদমকে সেজদা কর। তাই তারা সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল।"

এই মহান ঘটনা থেকে অনেক শিক্ষা নেওয়া যায়। প্রথমেই বুঝতে হবে সিজদা দুই প্রকার। হযরত আদম আলাইহিস সালামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ফেরেশতাদেরকে সিজদা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এটি আর বৈধ নয় এবং ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 1853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অন্য ধরনের সেজদা ইবাদতের জন্য এবং শুধুমাত্র মহান আল্লাহর জন্য।

উপরন্তু, ইবাদতের উপর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব এই ঘটনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হয়। এই ঘটনা ঘটলে হযরত আদম আলাইহিস সালামকে নতুন করে সৃষ্টি করা হয়। ইবাদত করার জন্য তার খুব বেশি সময় ছিল না, অথচ ফেরেশতা ও শয়তানরা অসংখ্য শতাব্দী ধরে মহান আল্লাহর ইবাদত করে আসছে। পবিত্র কুরআন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, হযরত আদম আলাইহিস সালামকে ফেরেশতাদের

থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়ার কারণ ছিল মহান আল্লাহ তাঁকে যে জ্ঞান দান করেছিলেন। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 31-32:

"এবং তিনি আদমকে নাম শিখিয়েছিলেন - সেগুলি সব। অতঃপর তিনি সেগুলো ফেরেশতাদেরকে দেখিয়ে বললেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে এগুলোর নাম আমাকে জানিয়ে দাও। তারা বলল, "আপনি মহিমান্বিত, আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের আর কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

এ থেকে স্পষ্ট যে, ইবাদতের চেয়ে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। এটা খুবই স্পষ্ট, কারণ সঠিক ইবাদত ও অন্যান্য নেক আমল জ্ঞান ছাড়া সঠিকভাবে করা যায় না। তাই দরকারী জ্ঞান অর্জন করা সকল মুসলমানের কর্তব্য। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রকৃত উপকারী জ্ঞান হল সেই জ্ঞান যা সঠিক এবং তার উপর আমল করা হয়। ইসলামে জ্ঞানের প্রকৃত মূল্য নেই।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে শয়তান একজন ফেরেশতা নয় কিন্তু সে তাদের মধ্যে বাস করার কারণে সেজদা করার আদেশ তাকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। অধ্যায় 18, শ্লোক 50।

"... ইবলিস ছাড়া। সে জ্বীনদের অন্তর্ভুক্ত ছিল"...

এই মহান অনুষ্ঠানে সর্বপ্রথম পাপ সংঘটিত হয়েছিল, হিংসা। শয়তান ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে যে নবসৃষ্ট নবী হযরত আদম (আঃ) কে মাটি দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল, যদিও তিনি আগুন থেকে তৈরি এবং অসংখ্য বছর ইবাদত করেছিলেন।

শয়তান ভুল করেছিল যখন সে ঘোষণা করেছিল যে আগুন কাদামাটির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আগুন জ্বলে ওঠে যা উচ্চতার চিহ্ন কিন্তু মহত্ত্ব একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য। অন্যদিকে, কাদামাটি নম্রতার একটি ইঙ্গিত যা মহান আল্লাহর প্রকৃত বান্দাদের বৈশিষ্ট্য।

সকল মুসলমানের উচিত যে কোন মূল্যে হিংসা পরিহার করা, কারণ আগুন যেমন কাঠকে ধ্বংস করে তেমনি এটি একজনের ভালো কাজকে ধ্বংস করে। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 4210 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি বেশ স্পষ্ট কারণ শয়তানের বহু শতাব্দীর উপাসনা এবং সৎকর্ম এই হিংসার কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে অহংকার জন্মেছিল। হিংসা করা একটি গুরুতর এবং বড় পাপের কারণ হল যে ঈর্ষাকারীর সমস্যাটি অন্য ব্যক্তির সাথে নয়, এটি প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে, কারণ তিনিই সেই নিয়ামত দান করেছেন যা হিংসা করা হয়। সুতরাং একজন ব্যক্তির হিংসা শুধুমাত্র মহান আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত বরাদ্দের সাথে তাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। তারা এমন আচরণ করে যেন তারা মহান আল্লাহর চেয়ে ভালো জানে।

হিংসা দ্বিতীয় খারাপ বৈশিষ্ট্যের দিকে পরিচালিত করে: অহংকার। যেহেতু শয়তান অসংখ্য বছর উপাসনা করেছে সে বিশ্বাস করেছিল যে এটি তাকে বিশেষ করে তুলেছে। তিনি এ ব্যাপারে গাফেল ছিলেন যে, তাঁর করা প্রতিটি ইবাদতই একমাত্র মহান আল্লাহর রহমতে সম্ভব। মহান আল্লাহ, যিনি জ্ঞান, অনুপ্রেরণা, শক্তি, সুযোগ এবং ভাল কাজ করার ইচ্ছা প্রদান করেন। অতএব,

একটি ভাল কাজের জন্য গর্ব করা নিছক বোকামি। একজনের এই মারাত্মক বৈশিষ্ট্য থেকে দূরে থাকা উচিত কারণ যে ব্যক্তির কাছে এটির একটি অণু পরিমাণও রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এটি সহীহ মুসলিম, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

শয়তান সেজদা করতে অস্বীকৃতি জানায় কারণ সে বিশ্বাস করে যে সে হযরত আদম (আঃ) এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, শয়তান মহান আল্লাহর প্রভুত্বকে অস্বীকার করেনি। পরিবর্তে, তিনি মহান আল্লাহর আদেশ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি মহান আল্লাহর আদেশের বশ্যতা স্বীকার না করে নিজের বিষয়গত চিন্তাভাবনা ব্যবহার করেছিলেন। এর ফলে তিনি পাপী ও কাফের হয়ে যান। এটি সমস্ত মানবজাতির জন্য একটি সুস্পষ্ট বার্তা যে, মহান আল্লাহর একজন প্রকৃত বান্দা, ঈমানের বিষয়ে তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা প্রয়োগ করেন না। একজন বান্দার কর্তব্য হল কেবল তাদের প্রভুর আদেশ পালন করা, এমনকি যদি তারা আদেশের পিছনে প্রজ্ঞা পালন না করে। এটাই প্রকৃত দাসত্ব। যারা প্রভুর আদেশকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তারা শুধু তাই করে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তারা নিজেরাই প্রভু। কিন্তু এটা সত্য নয়, কারণ মহান আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। একজন মুসলমানের ইসলামের আদেশের পিছনের প্রজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত নয়, কারণ এটি শয়তানের পথ। পরিবর্তে, তাদের উচিত নম্রভাবে তাদের কাছে জমা করা এবং লালিত ও আশীর্বাদপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের পথ অনুসরণ করা। অধ্যায় 66 তাহরীমে, আয়াত 6:

"...যার উপরে [নিযুক্ত] ফেরেশতা, কঠোর এবং কঠোর; তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না বরং তারা যা আদেশ করে তাই করে।"

মুসলমানরা জানে যে এই মহান ঘটনাটি শয়তানকে প্রলুব্ধ করে হযরত আদম (আঃ)-কে প্রলুব্ধ করেছিল, যার ফলে তিনি পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন যাতে তিনি পৃথিবীতে তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্থাৎ মহান আল্লাহর খলিফা পূর্ণ করতে পারেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 30:

"... অবশ্যই, আমি পৃথিবীতে একটি ধারাবাহিক কর্তৃত্ব তৈরি করব..."

হযরত আদম (আঃ) তাঁর অসীম রহমতের আশা না হারিয়ে নম্রতা প্রদর্শন করে এবং মহান আল্লাহর দিকে ফিরে আসার কারণে তাঁর ভুল ক্ষমা করেছিলেন। শয়তান বিভ্রান্তিতে বিস্মিত হয়ে পড়েছিল কারণ সে তার পাপ স্বীকার করেনি বা ক্ষমা প্রার্থনা করেনি, কারণ সে মহান আল্লাহর রহমতে আশা হারিয়ে ফেলেছিল। মুসলমানদের জন্য তাদের পূর্বপুরুষ হযরত আদম (আঃ) এর বৈশিষ্ট্যগুলি মেনে চলা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারা পাপ করতে বাধ্য। কখনও আশা ত্যাগ করা উচিত নয়, আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া উচিত এবং সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 6:

"... সুতরাং তাঁর কাছে সোজা পথে চলুন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন..."

কিন্তু মহান আল্লাহর প্রতি আশা এবং ইচ্ছাপূরণের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ। আশা সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের সাথে আবদ্ধ, যার মধ্যে রয়েছে আন্তরিক অনুতাপ। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা অনুভব করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যাদের উপর অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়, একই বা অনুরূপ পাপ

পুনরায় না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং যে কোনও অধিকার আদায় করে নেওয়া। আল্লাহ, মহান, এবং মানুষের সম্মান লঙঘন করা হয়েছে. যদিও, ইচ্ছাপূরণের চিন্তার মধ্যে অবিরতভাবে মহান আল্লাহকে অমান্য করা এবং তারপর তাঁর কাছে তাদের রহমত ও ক্ষমার প্রত্যাশা করা জড়িত। ইসলামে এর কোনো মূল্য নেই। এই সংজ্ঞাটি জামি আত তিরমিযী, 2459 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের আশা গ্রহণ করে তাদের পূর্বপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে, যার মধ্যে মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করা জড়িত। পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলোকে ব্যবহার করা এবং যখনই তারা কোনো পাপ করে তখন আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হন। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা এই পৃথিবীতে মানসিক ও শরীরের শান্তি পাবে এবং পরকালে তাদের পূর্বপুরুষের সাথে একত্রিত হবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এবং অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 20-23:

"যারা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং চুক্তি ভঙ্গ করে না। এবং যারা আল্লাহ যাকে সংযুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন তাতে যোগ দেয় এবং তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং [তাদের] হিসাব-নিকাশের অনিষ্টকে ভয় করে। তাদের পালনকর্তার মুখ [অর্থাৎ কবুল করুন] এবং সালাত কায়েম করুন এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করুন এবং মন্দকে

ভালোভাবে প্রতিরোধ করুন- তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী বাসস্থানের বাগান তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে যারা ধার্মিক ছিল তাদের সাথে প্রবেশ করবে..."

অঙ্গীকার

পরবর্তী যে মহান ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা করা হবে তা হল সেই ঘটনা যা মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর আগে সংঘটিত হয়েছিল এবং পবিত্র কুরআনের 172-173 নং আয়াত আল আরাফ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে:

"এবং [উল্লেখ করুন] যখন তোমার প্রভু আদম সন্তানদের থেকে - তাদের কোমর থেকে - তাদের বংশধরদের নিয়েছিলেন এবং তাদের নিজেদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, [তাদেরকে বলেছিলেন], "আমি কি তোমাদের প্রভু নই?" তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি। [এটি] - পাছে কেয়ামতের দিন আপনি বলতে না পারেন, "নিশ্চয়ই আমরা এ সম্পর্কে বেখবর ছিলাম।" অথবা আপনি বলবেন, "আমাদের বাপ-দাদারা ইতিপূর্বে আল্লাহর সাথে শরীক করেছিল এবং আমরা তাদের পরবর্তী বংশধর। তাহলে মিথ্যাবাদীরা যা করেছে তার জন্য আপনি কি আমাদের ধ্বংস করবেন?"

সমস্ত মানুষকে উদ্‌ভূত করা হয়েছিল যাতে তারা মহান আল্লাহর কাছে এই অঙ্গীকার নিতে পারে। এই ঘটনার পিছনে যে শিক্ষা রয়েছে তা হল, সমস্ত মানুষ মহান আল্লাহকে তাদের রব হিসেবে মেনে নিয়েছিল। অর্থ, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাদের টিকিয়ে রেখেছেন এবং যিনি বিচার দিবসে তাদের কর্মের বিচার করবেন। মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করার মাধ্যমে এই অঙ্গীকার পূরণ করা সকল মুসলমানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। , যাতে তারা উভয় জগতেই মনের এবং শরীরের শান্তি খুঁজে পায়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

মূল আয়াতটি ইঙ্গিত করে যে মহান আল্লাহ সৃষ্টিকে জিজ্ঞাসা করেননি যে তারা তার বান্দা কিনা, বরং তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি তাদের প্রভু কিনা। এটি একটি ইঙ্গিত যে মহান আল্লাহর ইচ্ছা সর্বদা একজন ব্যক্তির ইচ্ছা ও ইচ্ছার আগে আসা উচিত। যদি একজন মুসলমানের আল্লাহ, মহান বা অন্য কাউকে সন্তুষ্ট করার মধ্যে একটি পছন্দ থাকে, তবে এই অঙ্গীকারটি তাদের মনে করিয়ে দেবে যে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি সবার আগে আসতে হবে।

এই প্রশ্নটিও মহান আল্লাহর অসীম রহমতের ইঙ্গিত, কারণ তিনি সৃষ্টির প্রতি উত্তরের ইঙ্গিত দিয়েছেন শব্দের মাধ্যমে। এটি মুসলমানদের দেখায় যে যদিও মহান আল্লাহই প্রভু যিনি তাদের কাজের বিচার করবেন, তিনিও অসীম করুণাময়।

এই চুক্তির প্রভাব সমস্ত মানবজাতির হৃদয়ে গভীরভাবে গেঁথে আছে। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রকৃতিরই ইঙ্গিত সহীহ মুসলিমের ৬৭৫৫ নম্বর হাদিসে পাওয়া গেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের জন্য আগে থেকে মন স্থির করে সত্যের সন্ধান না করে প্রমাণের সন্ধান করা জরুরি। যা তাদের পূর্বনির্ধারিত বিশ্বাসকে সমর্থন করে। শুধুমাত্র তারাই যারা পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত না নিয়ে তাদের মন খোলে তারা এই চুক্তিটি আনলক করবে যা তাদের হৃদয়ের গভীরে গেঁথে আছে। প্রকৃতপক্ষে, খোলা মন থাকা সমস্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ, শুধুমাত্র

বিশ্বাসের বিষয়ে নয়, কারণ এটি একজনকে সত্য এবং সর্বোত্তম পথ খুঁজে পেতে সহায়তা করে। এই মনোভাব সমাজকে শক্তিশালী করে এবং সর্বদা মানুষের মধ্যে শান্তিকে উৎসাহিত করে। কিন্তু যারা তাদের পছন্দগুলি পূর্বনির্ধারণ করে তাদের একগুঁয়েমি সর্বদা একটি সমাজের সদস্যদের মধ্যে কীলক তৈরি করবে, যা জাতীয় স্তরের মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে। মুসলমানদের জন্য এটা জরুরী যে তারা সবসময় বিশ্বাস করবে না যে তারা পার্থিব বিষয়ে সঠিক, অন্যথায় তারা এই একগুঁয়ে মনোভাব গ্রহণ করবে। এটি তাদের অন্যের মতামত গ্রহণ করতে বাধা দেবে, যা তর্ক, শত্রুতা এবং সম্পর্ক ভাঙার দিকে পরিচালিত করবে। অতএব, এই মনোভাব যেকোন মূল্যে পরিহার করা উচিত।

এই চুক্তিটি যে ব্যক্তির হৃদয়ে গভীরভাবে গেঁথে আছে তা ইঙ্গিত করে যে এটি উন্মোচন করা মুসলমানদের কর্তব্য। এটি একজনকে বিশ্বাসের নিশ্চিততার দিকে নিয়ে যাবে যা শোনার অর্থের উপর ভিত্তি করে বিশ্বাসের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, একজনের পরিবারের দ্বারা বলা হয় যে তারা একজন মুসলিম। বিশ্বাসের নিশ্চিততা একজন মুসলিমকে তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে এই পৃথিবীতে সফলভাবে সমস্ত অসুবিধা অতিক্রম করতে দেয়। একজন শুধুমাত্র তাদের বিশ্বাসের দুর্বলতার কারণে পরীক্ষা এবং তাদের কর্তব্যে ব্যর্থ হয়। ঈমানের নিশ্চিততা কেবলমাত্র পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের মধ্যে প্রাপ্ত জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

মূল আয়াতের শেষ অংশ মানবজাতিকে সতর্ক করে অন্যদের অন্ধভাবে অনুকরণ না করার জন্য। মানুষের জন্য তাদের দেওয়া বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করা এবং গবাদি পশুর মতো আচরণ করা এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ। অন্ধভাবে অন্যকে অনুসরণ করা দুনিয়ার আদালতে অগ্রহণযোগ্য অজুহাত, তাহলে মহান আল্লাহর দরবারে তা কীভাবে গৃহীত হবে? অন্ধ অনুকরণ হল এমন একটি বিষয় যা ইসলামে সমালোচিত হয়েছে , যেহেতু একজন মুসলিমকে মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার সত্যতা ও গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য তাদের সাধারণ জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 108:

"বল, "এটা আমার পথ; আমি অন্তর্দৃষ্টি সহকারে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাই, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করে...""

অতএব, ইসলামের সুস্পষ্ট প্রমাণের প্রশংসা করার জন্য একজনকে অবশ্যই ইসলামী জ্ঞান শিখতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে যাতে তারা নিশ্চিতভাবে তা অনুসরণ করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর দৃঢ়ভাবে টিকে থাকবে, যেমন কষ্টের সময় ধৈর্য্যশীল এবং সহজের সময়ে কৃতজ্ঞতা, উভয়ের মধ্যেই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা জড়িত। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত সুউচ্চ।

হযরত আদম (আঃ) এর অবতরণ

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে আল বাকারাহ, ৩৪ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

"আমরা বলেছিলাম, তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও। আর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়েত আসবে, যে আমার পথনির্দেশ অনুসরণ করবে, তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিত হবে না।"

এটি আলোচনা করে যখন হযরত আদম আলাইহিস সালামকে শয়তান দ্বারা প্রতারিত হওয়ার পর জান্নাত থেকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল। জীবনে, একজন মুসলমান সর্বদাই হয় স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বা কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয়। কিছু অসুবিধার সম্মুখীন না হয়ে কেউ স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করে না। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, যদিও কষ্টগুলো মোকাবেলা করা কঠিন, তবুও এগুলো প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি প্রকৃত মহত্ত্ব ও দাসত্ব অর্জন ও প্রদর্শনের একটি মাধ্যম। উপরন্তু, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ যখন সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তারা যখন স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলির মুখোমুখি হয় তখন আরও গুরুত্বপূর্ণ জীবনের পাঠ শিখে। এবং লোকেরা প্রায়শই স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ের চেয়ে অসুবিধার সময়গুলি অনুভব করার পরে আরও ভালভাবে পরিবর্তিত হয়। এই সত্যটি বোঝার জন্য একজনকে কেবল এটির প্রতি চিন্তা করা দরকার। প্রকৃতপক্ষে, কেউ যদি পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে আলোচনা করা বেশিরভাগ ঘটনাই অসুবিধার সাথে জড়িত। এটি ইঙ্গিত দেয় যে সত্যিকারের মহত্ত্ব সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলি অনুভব করার মধ্যে থাকে না। প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে নিয়তির মোকাবিলা

করার মাধ্যমে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া। এটি আলোচনার মূল আয়াত দ্বারা এবং এই সত্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ইসলামী শিক্ষায় আলোচিত প্রতিটি বড় কঠিন সমস্যাই চূড়ান্ত সাফল্যের সাথে শেষ হয় যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে। তাই একজন মুসলমানের অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয়, কারণ এই মুহূর্তগুলি তাদের জন্য উজ্জ্বল হওয়ার মুহূর্ত এবং আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের প্রকৃত দাসত্ব স্বীকার করে। এটি উভয় জগতে চূড়ান্ত সাফল্যের চাবিকাঠি।

মূল আয়াতটি এটাও স্পষ্ট করে যে শুধুমাত্র ইসলামে বিশ্বাস করাই যথেষ্ট নয়, কারণ সাফল্যের প্রতিশ্রুতি শুধুমাত্র তাদেরই দেওয়া হয়েছে যারা বাস্তবে মহান আল্লাহর নির্দেশনা অনুসরণ করে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা এর সাথে জড়িত।

পরিশেষে, এই আয়াতটিও নিশ্চিত করে যে মুসলমানরা এই পৃথিবীতে অসুবিধার সম্মুখীন হবে, কিন্তু তারা যদি মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অটল থাকে তবে তারা তাদের দ্বারা পরাস্ত হবে না। অর্থ, তারা এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে যা তাদের ভয় দেখায় কিন্তু তাদের ভয় তাদের কাটিয়ে উঠবে না। তারা চাপ এবং দুঃখের মুখোমুখি হবে কিন্তু এটি তাদের দুঃখের দিকে ঠেলে দেবে না। তাই তারা মন এবং শরীরের একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা পাবে, যা মন এবং শরীরের শান্তি পাওয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

হযরত আদম (আঃ) এর দুই পুত্র

পরবর্তী মহান ঘটনা যা সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে তা হল হযরত আদম (আঃ) এর দুই পুত্রের কাহিনী এবং কিভাবে হিংসার বশবর্তী হয়ে একজন অপরজনকে হত্যা করেছিল। এই ঘটনাটি আল মায়িদাহ 5 অধ্যায়ে, 27-31 আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে:

“এবং তাদের কাছে আদমের দুই পুত্রের কাহিনী শুনাও, যখন তারা উভয়েই [আল্লাহর কাছে] কুরবানী করেছিল, এবং তাদের একজনের কাছ থেকে তা গৃহীত হয়েছিল কিন্তু অন্যজনের কাছ থেকে গৃহীত হয়নি। [পরবর্তী] বলল, "আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব।" [প্রাক্তন] বললেন, "নিশ্চয়ই, আল্লাহ কেবলমাত্র ধার্মিকদের কাছ থেকে কবুল করেন [যারা তাকে ভয় করে]। যদি তুমি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার দিকে হাত বাড়াও - আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে হাত বাড়াবো না। আমি আল্লাহকে ভয় করি। , বিশ্বজগতের প্রভু, আমি চাই তুমি আমার পাপ এবং তোমার পাপ পাবে যাতে তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" আর তার আত্মা তাকে তার ভাইয়ের হত্যার অনুমতি দিল, ফলে সে তাকে হত্যা করল এবং ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা একটি কাক পাঠালেন যাতে তিনি তার ভাইয়ের অপমান লুকিয়ে রাখতে পারেন। তিনি বললেন, হায় হায় আমার! আমি কি এই কাকের মত হয়ে আমার ভাইয়ের অসম্মান [অর্থাৎ শরীর] গোপন করতে ব্যর্থ হয়েছি? এবং সে অনুতপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।”

এটি একটি খুব বিখ্যাত গল্প, যার বিবরণ খুব পরিচিত তাই এটিকে বিশদভাবে বর্ণনা করার দরকার নেই। এই মহান ঘটনা থেকে অনেক শিক্ষা নেওয়া যায়, যার মধ্যে একটি হল হিংসার বিপদ। মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে

হিংসা একটি অদ্‌ভুত পাপ কারণ এটি হিংসাকারীকে প্রভাবিত করে না যতক্ষণ না ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চালিত হয়। অর্থ, ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি একাই কষ্ট ভোগ করে যখন ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি কোনো সমস্যা সম্পর্কে অজান্তেই জীবনযাপন করে। ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি উভয় জগতেই কষ্ট ভোগ করে যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং এটি তাদের ভালো ও বৈধ উপায়ে যা চায় তা পেতে সহায়তা করে না। হিংসা একটি বড় পাপ কারণ এটি মহান আল্লাহর বরাদ্দ পছন্দকে চ্যালেঞ্জ করে। একজনকে অবশ্যই এই অজ্ঞতাপূর্ণ মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং পরিবর্তে স্বীকার করতে হবে যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের জন্য সর্বোত্তম দান করেন। অধ্যায় 42 আশ শুরা, আয়াত 27:

"এবং আল্লাহ যদি তাঁর বান্দাদের জন্য [অতিরিক্ত] রিযিক প্রসারিত করতেন, তবে তারা সারা পৃথিবীতে অত্যাচার করত। কিন্তু তিনি [এটি] পরিমাণে নাযিল করেন যা তিনি চান। তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে অবগত ও সর্বদ্রষ্টা।"

অতএব, তাদের উচিত অন্যদের দেখার জন্য তাদের সময় নষ্ট না করে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের প্রদত্ত নেয়ামতগুলো ব্যবহার করার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে এবং তাদের দেয়া নেয়ামতগুলোকে তাদের দেয়া হয়েছে। এই মনোভাব মানসিক এবং শরীরের শান্তির দিকে পরিচালিত করবে, এমনকি যদি তারা তাদের কাঙ্খিত সমস্ত জিনিস না পায়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এ ঘটনা থেকে আরেকটি বিষয় যা বোঝা যায় তা হলো, যে ভাই মহান আল্লাহকে ভয় করত, তার কুরবানী কবুল হয়, অথচ হিংসুক ভাইয়ের কুরবানী হয় নি। এটি নিয়তের গুরুত্বকে তুলে ধরে। যখন কেউ সৎকাজ করে, তখন তাদের তা করা উচিত মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, জড় জগতের লোভ থেকে নয়। এ থেকে স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে আমল করা হয়, তা তাঁর কাছে কবুল হয়। অন্য সব নেক আমল কিয়ামতের দিন ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

এছাড়াও, এই অনুষ্ঠানটি অভিনয়ের আগে চিন্তা করার গুরুত্ব দেখায়। মহানবী হযরত আদম (আঃ) এর সন্তানের মত অসংখ্য মানুষ বড় আফসোসের সম্মুখীন হয়েছে, কারণ তারা প্রথমে কাজ করেছে এবং পরে চিন্তা করেছে। যদিও, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্বদা প্রথমে চিন্তা করে এবং যদি কর্মটি উপকারী হয় তবে তারা কাজ করে। হযরত আদম (আঃ) এর হত্যাকৃত পুত্র প্রথম প্রতিফলিত হয়েছিল এবং এই প্রতিফলন তাকে বুঝতে সাহায্য করেছিল যে যদি সে তার ভাইয়ের সাথে যুদ্ধ করে তবে এটি একটি পাপ এবং শেষ পর্যন্ত জাহান্নামের দিকে নিয়ে যেতে পারে। অভিনয় করার আগে প্রথমে চিন্তা করা একটি বহুল স্বীকৃত বৈশিষ্ট্য, তবুও অনেকে এটি করতে ব্যর্থ হন। কেউ কেউ চিন্তা না করেই এমন কথা বলে যা তাদেরকে এই পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের চেয়েও বেশি জাহান্নামে পতিত করবে। সহীহ মুসলিমের ৭৪৮১ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। চিন্তা না করে কাজ করার কারণে অগণিত মানুষ সম্পর্ক নষ্ট করেছে। এই কারণেই সমাজে বেশিরভাগ অপরাধ সংঘটিত হয়। এটা সত্যিই বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে পদক্ষেপগুলি ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। এই কারণে অভিনয় করার আগে সর্বদা চিন্তা করা অত্যাবশ্যক। অন্যথায় হযরত আদম (আঃ) এর পুত্রের মত উভয় জগতেই একজনকে চরম আফসোসের সম্মুখীন হতে হবে।

মহাপ্রলয়

পরবর্তী যে মহান ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা করা হবে তা হল মহানবী নূহ (আঃ) এর সময়ে ঘটে যাওয়া মহাপ্লাবন। পবিত্র কোরআনে একাধিকবার এ কথা বলা হয়েছে। মহানবী নূহ (আঃ) তাঁর লোকদের কাছে ঈমানের বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রায় 950 বছর উত্সর্গ করেছিলেন। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 14:

"এবং অবশ্যই আমরা নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি, এবং তিনি তাদের মধ্যে এক হাজার বছর কম পঞ্চাশ বছর অবস্থান করেছিলেন এবং বন্যা তাদের পাকড়াও করেছিল যখন তারা ছিল জালেম।"

এ ধরনের প্রচেষ্টার পর মুষ্টিমেয় কিছু লোকই ঈমান গ্রহণ করেছিল। অধ্যায় 11 হুদ, আয়াত 40:

"[এমনটিই হয়েছিল], যতক্ষণ না আমাদের হুকুম এল এবং চুলা উপচে পড়ল, আমরা বললাম, "এর উপর ভর কর প্রত্যেকটি [প্রাণীর] দুইজন সঙ্গী এবং আপনার পরিবারকে, যাদের সম্পর্কে এই কথাটি [অর্থাৎ, ফরমান] পূর্বে হয়েছে, এবং যারা ঈমান এনেছে তাকে [অন্তর্ভুক্ত করুন।

এ থেকে শিক্ষা নেওয়া যায় যে, মানুষ উপদেশ গ্রহণ না করলেও কখনোই ভালো উপদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজে নিষেধ করা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। নবী নুহ (আঃ) এর মত অবিচল থাকা উচিত এবং কয়েকবার চেষ্টা করেও হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। একজন মুসলমানের কর্তব্য হলো নিজে ভালো কাজ করা এবং অন্যকেও তা করার উপদেশ দেওয়া এবং এই উপদেশ গ্রহণ করা হবে কিনা তা তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। একজন ব্যক্তির সর্বদা মনে রাখা উচিত যে সহীহ বুখারী, 1 নম্বর একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সমস্ত কাজ তার নিয়তের দ্বারা বিচার করা হয়। সুতরাং এই ক্ষেত্রে, ফলাফলটি আসলেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, অর্থ, লোকেরা একজন ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করে বা কাজ করে কিনা। পরিবর্তে, এটি তাদের উদ্দেশ্য যা পুরস্কৃত হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একটি ভাল উদ্দেশ্য রাখে, সে অনেক পুরস্কার পাবে, যদিও কেউ তাদের উপদেশ গ্রহণ না করে। অন্যদিকে, একজন মুসলমান কোন পুরস্কার পাবে না এবং এমনকি শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে, এমনকি যদি লক্ষ লক্ষ লোক তাদের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে, যদি তাদের উদ্দেশ্য খারাপ হয়, যেমন প্রদর্শন করা। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ তাদের শক্তি অনুযায়ী কর্মের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য প্রমাণ করে, ততক্ষণ তাদের মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং মহান পুরস্কারের আশা করা উচিত।

উপরন্তু, যখন কেউ ভাল কাজ করে তখন লোকেরা তাদের পরামর্শ গ্রহণ করে বা তাদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করলে তাদের বিরক্ত করা উচিত নয়, যেমন মহান আল্লাহ স্পষ্ট করেছেন যে তিনি তাঁর বান্দাদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 30:

"...নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও কৃতজ্ঞ।"

সুতরাং কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রশংসা অর্জন করে, তবে তাদের অন্য কিছুর পরোয়া করা উচিত নয়।

এই মহান ঘটনার অন্য দিকটি হুদ 11 অধ্যায়ে, 45-46 আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

"আর নূহ তার পালনকর্তাকে ডাকলেন এবং বললেন, হে আমার প্রভু, আমার সন্তান আমার পরিবারভুক্ত; এবং নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য; এবং আপনি বিচারকদের মধ্যে সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ।" তিনি বললেন, হে নূহ, নিশ্চয়ই সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়, তিনি এমন একজন যিনি সৎকর্ম ব্যতীত অন্য কাজ করেছেন, অতএব আমার কাছে এমন কিছু চাইবেন না যার বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, পাছে তুমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও।"

এই আয়াতে মহানবী নূহ (আঃ) এর অবিশ্বাসী পুত্র মহাপ্লাবনে ডুবে যাওয়ার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যদিও, তিনি হযরত নূহ (আঃ)-এর জৈবিক পুত্র ছিলেন, তথাপি মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে তিনি তাঁর পরিবারের অর্থাৎ ঈমানের পরিবারের সদস্য নন। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একজনের গর্ব করা উচিত নয় এবং পরকালে সফল হওয়ার জন্য তাদের পারিবারিক বন্ধনের উপর নির্ভর করা উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব উদ্দেশ্য, প্রচেষ্টা এবং কাজ অনুযায়ী বিচার করা হবে। একজন ব্যক্তি ভালো কাজের মাধ্যমে অন্যদের উপকার করতে পারে, যেমন তাদের পক্ষ থেকে দান করা, যা সহীহ বুখারি, 2770 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু একজন ব্যক্তি সৎ কাজ এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে থাকতে পারে না। এবং তারপর তাদের আত্মীয়দের কাজ এবং মর্যাদা তাদের বাঁচাতে আশা. সুনানে ইবনে

মাজাহ, ২২৫ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এইভাবে কাজ করবে তার পরিণতি হযরত নূহ (আঃ)-এর পুত্রের মতই হতে পারে।

পবিত্র কুরআন ও ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা জড়িত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাদেরকে সকল অসুবিধা থেকে মুক্তির পথ দান করা হবে, যদিও সেই সময়ে তা অসম্ভব মনে হয়, ঠিক যেমন মহানবী নূহ (আঃ) এবং তাঁর অনুসারীরা রক্ষা পেয়েছিলেন। তালাকে অধ্যায় 65, আয়াত 2-3:

"এবং যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন। এবং তাকে এমন রিজিক দেবেন যেখান থেকে সে আশাও করে না। আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট..."

মহানবী ইব্রাহিম (আঃ) এর ঘোষণা

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে অধ্যায় 6 আল আনআম, 78-79 আয়াতে পাওয়া যায়:

"এবং যখন তিনি সূর্যকে উদিত হতে দেখলেন, তিনি বললেন, "ইনি আমার প্রভু, এটিই মহান।" অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল, তখন সে বলল, "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যাকে আল্লাহর সাথে শরীক করছ, আমি তা থেকে মুক্ত। আমি সত্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে আসমান ও যমীন সৃষ্টিকর্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে।"

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের মিথ্যা উপাস্যদের প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং এর পরিবর্তে মহান আল্লাহর কাছে তাঁর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বিশেষভাবে তাদের অস্থায়ী প্রকৃতির ইঙ্গিত করে তাদের মিথ্যা দেবতাদের প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যেমন তারা যে সূর্যের উপাসনা করত, যেটি তাদের প্রতি তাদের ভুল ভক্তিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেছিল।

এই জড় জগতের অতিরিক্ত এবং অপ্রয়োজনীয় উপাদানের প্রতি বা অন্যদের প্রতি তাদের ভক্তি ও উৎসর্গকে ভুলভাবে না ফেলে মুসলমানদের জন্য তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করা গুরুত্বপূর্ণ, ইসলামের নির্ধারিত সীমার বাইরে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যে বিষয়গুলো নির্দেশ করেছেন সেগুলো যেমন ম্লান হয়ে যায় এবং ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতির, তেমনি এই জড়জগতও। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 8:

"এবং অবশ্যই, আমরা তার উপর যা আছে তা একটি অনুর্বর ভূমিতে পরিণত করব।"

তাই অপ্রয়োজনীয়ভাবে ম্লান বস্তুজগতের জন্য নিজের প্রচেষ্টাকে উৎসর্গ করা অর্থহীন এবং এটিকে একজনের প্রধান ফোকাস, তাদের মহাবিশ্বের কেন্দ্র এবং তাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য করা নিছক বোকামি কারণ এটি তাদের প্রচেষ্টার সাথে শেষ পর্যন্ত চলে যাবে। অন্যথায়, তারা কেবল ধূলিকণা, অনুশোচনা এবং তাদের কর্মের পরিণতি নিয়ে অবশিষ্ট থাকবে। এই বাস্তবতাটি বেশ সুস্পষ্ট যখন কেউ তাদের নিজের জীবন এবং সেই মুহূর্তগুলি, জিনিসগুলি এবং লোকেদের প্রতি প্রতিফলিত করে যেগুলি এখনও দুর্দান্ত এবং স্থায়ী বলে মনে হয়েছিল, সেগুলি এমনভাবে বিবর্ণ হয়ে গেছে যেন তারা প্রথম স্থানে ছিল না।

এর পরিবর্তে একজনের উচিত মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ধার্মিক পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই জড় জগতে সংগ্রাম করে তাদের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনগুলি অপচয় বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই পূরণ করার জন্য। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলো ব্যবহার করা উচিত যাতে তারা শরীর ও মনের শান্তি পায়। উভয় জগত অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এটি নিশ্চিত করবে যে যখন বস্তুগত জগতটি চলে যাবে, তখন তাদের কাছে আশীর্বাদ এবং সৎ কাজ থাকবে যা তাদের প্রয়োজনের সবচেয়ে বড় মুহূর্তে তাদের সাহায্য করবে।

এইভাবে কেউ তাদের মুখ ফিরিয়ে নেয় যিনি নভোমন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, ঠিক যেমনটি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) করেছিলেন।

মহানবী ইব্রাহীম (আ.) ও মহা আগুন

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে তা হল যখন মহানবী ইব্রাহীম (আঃ)-কে হত্যা করার জন্য একটি মহান আগুন সৃষ্টি করা হয়েছিল। এটি একটি অত্যন্ত বিখ্যাত ঘটনা এবং মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিচিত, তাই এর বিস্তারিত বিবরণে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সংক্ষেপে বলা যায়, যারা বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করেছিল তারা একটি বড় অগ্নি প্রজ্জ্বলন করেছিল এবং হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে একটি ক্যাটপল্ট দিয়ে তাতে নিক্ষেপ করেছিল। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 68:

"তারা বলল, "তাকে জ্বালিয়ে দাও এবং তোমার দেবতাদের সমর্থন কর - যদি তুমি কাজ করতে চাও।"

এই মহান ঘটনা থেকে অনেক শিক্ষা নেওয়া যায়। যার মধ্যে প্রথমটি হল হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর অটল মনোভাব গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য। যদিও বিরাট শক্তি তাঁর বিরুদ্ধে ছিল, তবুও তিনি সত্যের পথ থেকে সরে যাননি এবং সামান্যতম আপোষ না করে অবিচল ছিলেন। মুসলমানদের জন্য সামাজিক চাপের কাছে না আসা এবং তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করা গুরুত্বপূর্ণ। যারা তা করে তারা কিছু অস্থায়ী পার্থিব সাফল্য অর্জন করতে পারে তবে এটি উভয় জগতে তাদের জন্য চাপের উত্স হয়ে উঠবে এবং এটি শেষ পর্যন্ত ম্লান হয়ে যাবে, তাদের খালি হাতে রেখে যাবে। একজনকে কেবল অগণিত সেলিব্রিটিদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে যারা পার্থিব সাফল্য অর্জনের জন্য তাদের মূল্যবোধের সাথে আপস করেছিলেন এবং কীভাবে এই সাফল্য তাদের বিষণ্নতা, পদার্থের অপব্যবহার এবং কিছু ক্ষেত্রে আত্মহত্যার দিকে নিয়ে যায়। পক্ষান্তরে, যারা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অটল ছিল, যার মধ্যে আশীর্বাদ ব্যবহার করা জড়িত, তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে মঞ্জুর করা

হয়েছে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী (সা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মনের এবং শরীরের শান্তি দেওয়া হয়েছিল, এমনকি তারা সম্পদের মতো কোনো সুস্পষ্ট পার্থিব সাফল্য না পেলেও। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

যেহেতু তাদের আধ্যাত্মিক সাফল্যের মধ্যে মহান আল্লাহর আশীর্বাদ রয়েছে, এটি তাদের পরকালের দিকে তাদের যাত্রার প্রস্তুতিতে সহায়তা করেছিল। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 30:

“নিশ্চয়ই যারা বলেছে, “আমাদের রব আল্লাহ” অতঃপর সঠিক পথে রয়ে গেছে, তাদের উপর ফেরেশতারা অবতীর্ণ হবেন, [বলবেন], “ভয় পেও না এবং দুঃখ করো না বরং জান্নাতের সুসংবাদ পাও। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।"

এটা স্পষ্ট যে, মহানবী ইব্রাহিম (আঃ) এই মহান ঘটনা জুড়ে ধৈর্য্য ধরেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি ধৈর্য অতিক্রম করে তৃপ্তির স্তরে পৌঁছেছিলেন। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হল যে ধৈর্যশীল সে পরিস্থিতি সম্পর্কে অভিযোগ করে না বরং পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে এবং এমনকি প্রার্থনা করে। পক্ষান্তরে, যে সন্তুষ্ট সে তাদের নিজের পছন্দের চেয়ে মহান আল্লাহর পছন্দকে প্রাধান্য দেয় এবং তাই কিছু পরিবর্তন করতে চায় না। মহানবী ইব্রাহীম (আঃ)

তাকে বাঁচানোর জন্য মহান আল্লাহর কাছে সহজে প্রার্থনা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সম্ভাব্যভাবে মহান আল্লাহর ইচ্ছার বিরোধিতা করতে চাননি, কারণ মহান আল্লাহ হয়তো তাকে শহীদ হতে চেয়েছিলেন। যদিও একটি প্রার্থনা এখনও বৈধ ছিল, তবুও তিনি মহান আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ দাসত্ব করতে চেয়েছিলেন এবং তাই মহান আল্লাহর পছন্দের উপর আস্থা রেখে নীরব ছিলেন। শেখার শিক্ষাটি হল যে, যদিও কিছু পরিস্থিতি দেখা দেয় এবং কষ্টদায়ক মনে করে, এই ঘটনার আগুনের মতো, দীর্ঘমেয়াদে, যা ঘটে তা একজন মুসলিমের জন্য তাদের ইচ্ছার চেয়ে উত্তম, যদিও তারা অবিলম্বে প্রজ্ঞাটি পালন না করে। তাদের পেছনে। একজন মুসলিমকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর কারণ হতে পারে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

সন্তুষ্টির অর্থ জান্নাতে প্রবেশের মতো ইসলামের সুপারিশকৃত জিনিস চাওয়া ও কামনা করা থেকে বিরত থাকা। কিন্তু এর সাথে পার্থিব জিনিস চাওয়া থেকে বিরত থাকা জড়িত যা মহান আল্লাহর পছন্দের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে এবং এর সাথে আল্লাহর পছন্দকে গ্রহণ করা এবং পছন্দ করা জড়িত, যখন জিনিসগুলি কাঙ্ক্ষিত বা পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে না।

মহান আল্লাহর হুকুমে সন্তুষ্ট না থাকলে অন্তত ধৈর্যধারণ করা জরুরি। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ..."

একজন মুসলমানকে এটাও মনে রাখতে হবে যে, যিনি তাদের জন্য পরিস্থিতি বেছে নিয়েছেন, তিনিই তাদের নিরাপদে সেখান থেকে বের করে আনতে পারেন। এটি কেবলমাত্র তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবেলা করার মাধ্যমে অর্জন করা হয়। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 2:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও কিয়ামত

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে পবিত্র ইব্রাহিম (আঃ) এর সাথে জড়িত এবং পবিত্র কুরআনের 260 নং আয়াতে আল বাকারাহ 2 অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে:

"এবং [উল্লেখ করুন] যখন ইব্রাহীম বলেছিলেন, "হে আমার প্রভু, আমাকে দেখান কিভাবে আপনি মৃতকে জীবন দেন।" [আল্লাহ] বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করনি? তিনি বললেন, "হ্যাঁ, কিন্তু [আমি জিজ্ঞাসা করছি] যাতে আমার হৃদয় সন্তুষ্ট হয়।" [আল্লাহ] বললেন, "চারটি পাখি নাও এবং সেগুলিকে নিজের কাছে নিবেদন কর, তারপর [জবাই করার পর] প্রতিটি পাহাড়ে তাদের একটি অংশ রাখ, তারপর তাদের ডাক, তারা দ্রুত তোমার কাছে আসবে...""

প্রথমত, এটা উল্লেখ করতে হবে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পুনরুত্থানের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি কারণ তাঁর কোন সন্দেহ ছিল। একজন মহানবী (সা.) সম্পর্কে এ ধরনের মন্দ ধারণা পোষণ করা বোকামি। তার বিশ্বাস সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি স্পষ্টভাবে ইতিবাচক উত্তর দেন। এটি পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ আছে এবং তাই এটি চ্যালেঞ্জযোগ্য নয়।

এই ঘটনা থেকে শেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল বিশ্বাসের নিশ্চিততা অর্জনের গুরুত্ব। বিশ্বাসের বিভিন্ন স্তর রয়েছে যা একজন মুসলমান গ্রহণ করতে পারে। দুর্বল বিশ্বাসী ব্যক্তি সেই ব্যক্তির মত যাকে বলা হয়েছে যে তাদের বেডরুমে একটি সাপ রয়েছে যাকে তারা বিশ্বাস করে না, যেমন একজন

অপরিচিত ব্যক্তি। যদিও তারা ব্যক্তিটিকে বিশ্বাস করতে পারে তবুও তারা নিশ্চিত হতে পারবে না যে তথ্যটি সত্য। যার দৃঢ় বিশ্বাস আছে সে সেই ব্যক্তির মত যাকে বলে যে তাদের বেডরুমে একটি সাপ আছে যাকে তারা বিশ্বাস করে, যেমন একজন আত্মীয়। বিশ্বাসের এই স্তরটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল কারণ তারা তাদের বিশ্বাস করে এমন কাউকে বলেছিল, যেমন তাদের পিতামাতা। বিশ্বাসের পরবর্তী স্তর জ্ঞান, গবেষণা এবং অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন ব্যক্তি তার বেডরুমে সাপের চিহ্নগুলি দেখেন, যেমন তার কাটা চামড়া, কামড়ের চিহ্ন এবং অন্যান্য চিহ্ন। এই স্তরটি তখন অর্জিত হয় যখন একজন মুসলমান পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের মধ্যে প্রাপ্ত জ্ঞান লাভ করে এবং তার উপর কাজ করে। এর ফলে মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলী এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্যতা তাদের কাছে প্রকাশ পায়। তারা যত বেশি জ্ঞান অর্জন করবে এবং তার উপর কাজ করবে, তত বেশি নিদর্শন তাদের দেখানো হবে, যার ফলে তাদের বিশ্বাসের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর হল নিজের দৈহিক চোখ দিয়ে সাক্ষ্য দেওয়া, যা সমস্ত মানবজাতিকে তাদের মৃত্যুর পরে এবং বিচারের দিন দেওয়া হবে। এটি শারীরিকভাবে বেডরুমে সাপ দেখার মতো।

পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অধ্যয়নের মাধ্যমে এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়া সকল মুসলমানের জন্য অত্যাবশ্যক, যাতে তারা তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে

পারে। দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী কেবলমাত্র দুর্বল বিশ্বাসের অধিকারী ব্যক্তির চেয়ে সৎ কাজ করবে এবং পাপ থেকে বিরত থাকবে না বরং তারা ধৈর্যের মাধ্যমে তাদের জীবনে যেকোন অসুবিধার সম্মুখীন হবে এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করবে। তারা ইসলামের পরামর্শ অনুযায়ী প্রতিটি পরিস্থিতিতে সাড়া দেবে এবং অগণিত পুরস্কার পাবে। অর্থ, যখন তারা স্বাচ্ছন্দ্যের মুখোমুখি হবে তখন তারা মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, তাদের কাছে থাকা সমস্ত নেয়ামত সঠিকভাবে ব্যবহার করে। যখন তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন তারা ধৈর্য্য ধারণ করবে এবং এমনকি মহান আল্লাহ তাদের জন্য যা পছন্দ করেন তাতে সন্তুষ্ট থাকবে। এই আচরণ নিশ্চিত করবে যে তারা যে সমস্ত আশীর্বাদ প্রদত্ত হয়েছে তা তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে থাকবে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। এতে উভয় জগতেই মন ও শরীর শান্তি আসবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

মহান বলিদান

পরবর্তী যে মহান ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা করা হবে তা হল মহানবী হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর মহান আত্মত্যাগ। অধ্যায় 37 সাফফাত, আয়াত 102-107:

"এবং যখন তিনি তার সাথে পরিশ্রমের বয়সে উপনীত হলেন, তখন তিনি বললেন, "হে আমার বৎস, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে আমি তোমাকে কুরবানী করব, সুতরাং তুমি কি ভাবছ তা দেখ।" তিনি বললেন, হে আমার পিতা, আপনাকে যেভাবে আদেশ করা হয়েছে আপনি তা করুন। আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে সবরকারীদের মধ্যে পাবেন। অতঃপর যখন তারা উভয়ে আত্মসমর্পণ করল, তখন তিনি তাকে কপালে নামিয়ে দিলেন। আমরা তাকে ডেকে বললাম, হে ইব্রাহীম, তুমি স্বপ্ন পূরণ করেছ। নিঃসন্দেহে আমরা সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি। প্রকৃতপক্ষে, এটি ছিল স্পষ্ট বিচার। এবং আমরা তাকে একটি মহান কুরবানী দিয়ে মুক্তি দিয়েছিলাম।"

পরীক্ষা এবং পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়ার সময় ধৈর্যের গুরুত্ব বোঝার প্রথম পাঠ। একজন মুসলমানের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, মহান আল্লাহর কাছে যাঁরা তাঁদের চেয়েও বেশি প্রিয়, অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের চেয়েও অনেক কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2472 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর চেয়ে বেশি কেউ পরীক্ষা করা হয়নি। ধৈর্যের সাথে মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রেখে নিজের কাজ ও কথাবার্তার মাধ্যমে অভিযোগ এড়িয়ে চলার অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান

আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত।

মুসলমানদের এটাও মনে রাখা উচিত যে তারা যে পরিস্থিতিতেই পড়ুক না কেন, এটি তাদের জন্য উপকারী, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। সহীহ মুসলিম, 7500 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দ্বারা উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদি কোন মুসলমান কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং ধৈর্য্য ধারণ করে, তবে তারা এর জন্য পুরস্কৃত হবে। এবং যদি তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় মোকাবেলা করে এবং কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে, তাদের দেওয়া আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে, তারা এর জন্য পুরস্কৃত হবে। সুতরাং এই হাদিস অনুসারে, একজন মুসলিম যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তা উপকারী, যদিও তারা এর পেছনের প্রজ্ঞা লক্ষ্য না করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

মুসলমানদের এটাও বোঝা উচিত যে তারা এমন একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে যা তাদের জন্য মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে, তারা তাতে যেভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করুক না কেন। ধৈর্যের সাথে এর মোকাবিলা করলে তারা দুনিয়া ও পরকালে অগণিত পুরস্কার পাবে। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

কিন্তু যদি তারা অধৈর্যতার সাথে এর মুখোমুখি হয়, তাহলে তারা পুরস্কার হারাবে এবং তাদের মনোভাবের কারণে আরও চাপ সহ্য করবে। যেভাবেই হোক তাদের সেই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে যা তাদের জন্য নির্ধারিত, তাই তাদের অবশ্যই সেই পথ বেছে নিতে হবে যা উভয় জগতে পুরস্কার ও আশীর্বাদের দিকে নিয়ে যায়।

উপরন্তু, একজন মুসলমানের নির্বোধ হওয়া উচিত নয় এবং উপলব্ধি করা উচিত যে এই পৃথিবী জান্নাত নয়। এটি এমন একটি বিশ্ব যা মানবজাতিকে পরীক্ষা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, তাই এটি কখনই পরীক্ষা এবং পরীক্ষা মুক্ত হতে পারে না। অধ্যায় 67 আল মুলক, আয়াত 2:

"[তিনি] যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম..."

যখন একজন মুসলিম তার সহজাত প্রকৃতিকে চিনতে পারে, তখন অসুবিধা এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া তাদের অবাক করে না, কারণ তারা এই পৃথিবীতে বসবাস করার সময় এটি আশা করে। একইভাবে একজন ব্যক্তি আক্রমণের আশা করে যদি তারা নিজেকে একটি বন্য প্রাণীর সাথে খুঁজে পায়, তাদের এই পৃথিবীতে পরীক্ষা এবং পরীক্ষার আশা করা উচিত। এইভাবে মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিলে একজন মুসলিমকে পাহারা দেওয়া থেকে বিরত থাকবে, যা প্রায়ই অধৈর্যতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই মহান ঘটনা থেকে শেখার আরেকটি শিক্ষা হলো, যেভাবে মানুষ এই জড়জগতে ত্যাগ ছাড়া সম্পদ অর্জন করতে পারে না, তেমনি একজন মুসলমানও ত্যাগ ব্যতীত মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে না। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 2:

"মানুষ কি মনে করে যে, "আমরা ঈমান এনেছি" বলতে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদের বিচার করা হবে না?

মুসলমানদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, মহান আল্লাহ তাদের পবিত্র নবী ইব্রাহিম (সাঃ) এবং অন্যান্য নবী (সাঃ) এর মত বড় ত্যাগ স্বীকার করতে চান না। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে কুরবানী করেছিলেন, মহান আল্লাহও মুসলমানদেরকে সেভাবে কোরবানি করার দাবি করেননি। তারা তাদের ধন-সম্পদ, বাড়িঘর, পরিবার ও জীবন উৎসর্গ করেছে। পরিবর্তে, মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে কয়েকটি বাধ্যতামূলক দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যার জন্য তাদের সময়, শক্তি এবং সম্পদের সামান্য ত্যাগ প্রয়োজন। কেউ যদি জান্নাতের মাহাত্ম্য নিয়ে চিন্তা করে, তবে তারা বুঝতে পারবে যে প্রতিশ্রুত পুরস্কারের তুলনায় তারা যে ত্যাগের জন্য উত্সাহিত হয়েছে তা খুবই সামান্য। অতএব, মুসলমানদের উচিত মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের সাথে আত্মসমর্পণ করে, তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

মহানবী হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর কুরবানী একটি ইঙ্গিত যে একজন মুসলমানকে সর্বদা মহান আল্লাহর আদেশের জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষা, ভালবাসা এবং ইচ্ছা ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পশু কোরবানি করার আচার-অনুষ্ঠান মুসলমানরা প্রতি বছর পালন করে, এটির প্রতিনিধিত্ব করে। এটি কেবল একটি পশু কোরবানি নয় বরং আরও অনেক কিছু। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 37:

"তাদের গোশত আল্লাহর কাছে পৌঁছাবে না এবং তাদের রক্তও পৌঁছাবে না, তবে তাঁর কাছে যা পৌঁছে তা হল তোমাদের তাকওয়া। এভাবেই আমরা তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি যাতে তিনি তোমাদেরকে যে পথ দেখিয়েছেন তার জন্য তোমরা আল্লাহর প্রশংসা করতে পারো।

মুসলমানদের উচিত সারা বছর এই আয়াতে উল্লিখিত তাকওয়া অবলম্বন করা, মহান আল্লাহর নির্দেশকে তাদের কামনা-বাসনার সামনে রেখে। তবেই তারা সঠিকভাবে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারবে।

এই মহান ঘটনা থেকে শেখার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল মহান আল্লাহর উপর ভরসা করা। এমনকি এমন পরিস্থিতিতেও যা অনিবার্য এবং বিপর্যয়কর বলে মনে হয়, এই মহান ঘটনার মতো, একজন মুসলিমের সর্বদা মহান আল্লাহর পছন্দের উপর আস্থা রাখা উচিত। মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে তাদের জ্ঞান খুবই সীমিত এবং তারা অত্যন্ত অদূরদর্শী। অর্থ, তারা মহান আল্লাহর পছন্দের পেছনের প্রজ্ঞাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে না। অন্যদিকে, মহান আল্লাহর জ্ঞান ও ঐশ্বরিক উপলব্ধি সীমাহীন। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত মহান আল্লাহর পছন্দের উপর আস্থা রাখা, যেমন একজন অন্ধ ব্যক্তি তাদের শারীরিক পথপ্রদর্শকের নির্দেশনায় বিশ্বাস করে।

একজন মুসলমানের মনোভাব যাই হোক না কেন, মহান আল্লাহর পছন্দ ঘটবে, তাই অধৈর্যতা দেখানোর পরিবর্তে তাঁর প্রজ্ঞার উপর আস্থা রাখাই উত্তম, যা কেবল আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বজায় রাখে, তিনি তাদের প্রদত্ত নিয়ামতগুলিকে তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করে, সর্বদা একটি বরকতময় অবস্থা থেকে পরবর্তীতে স্থানান্তরিত হবে, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়।

উপরন্তু, একজন ব্যক্তি যখন কিছু চায় তখন তার জীবনের অগণিত উদাহরণ মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, তা পাওয়ার পরে অনুশোচনা করা। এবং যখন তারা কিছু ঘটতে অপছন্দ করে, শুধুমাত্র পরে তাদের মন পরিবর্তন করার জন্য। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

যেহেতু ভাগ্য মানুষের হাতের বাইরে, সেহেতু মুসলমানদের জন্য জরুরী যে তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করা, যদি তারা অসুবিধা থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়, যেমন, মহান আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তা থেকে বিরত থাকা। তাঁর নিষেধাজ্ঞা এবং নিয়তির মোকাবিলা করে ধৈর্যের সাথে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী। মহান আল্লাহ ইতিমধ্যেই নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে তিনি একজন মুসলিমকে উভয় জগতের সমস্ত অসুবিধা থেকে রক্ষা করবেন। তাদের যা করতে হবে তা হল তাঁর আনুগত্য করা। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 2:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

যে জিনিসের নিয়ন্ত্রণে নেই তার অর্থ, ভাগ্যের উপর জোর দেওয়া এবং যে জিনিসের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে তার প্রতি উদাসীন থাকা, অর্থাৎ মহান আল্লাহর আনুগত্য করা বোকামি।

কাবা

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে তা হল যখন হযরত ইব্রাহিম ও তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ) তাঁর ঘর কাবা নির্মাণের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করেছিলেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 127:

"এবং [উল্লেখ করুন] যখন ইব্রাহীম ঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন এবং [তার সাথে] ইসমাঈল, [বলছিলেন], "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে [এটি] কবুল করুন, নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

এই মহান ঘটনা থেকে অনেক শিক্ষা নেওয়া যায়। মুসলমানদের উচিত সকল নবীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা, বাধ্যতামূলক দায়িত্বের বাইরে তাদের কিছু সময় ও শক্তি নিয়মিতভাবে কাজে নিয়োজিত করা যা মহান আল্লাহকে খুশি করে। কেউ মুসলমানদেরকে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা উৎসর্গ করার আদেশ দিচ্ছেন না, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন, তবে তাদের নিয়মিত কিছু উৎসর্গ করা উচিত। এই ঘটনাটি একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, যারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের প্রচেষ্টা ও সময় উৎসর্গ করে, তারা কেবল পুরস্কারই পাবে না, তাদের প্রচেষ্টা উভয় জগতের দর্শনের জন্যও স্মরণীয় হয়ে থাকবে। যদিও মহান আল্লাহর ঘর, কাবা, এখনও স্থাপত্যের আশ্চর্যের মতো মনে নাও হতে পারে, যেহেতু এটি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নির্মিত হয়েছিল, তবুও এটি আজও প্রতিষ্ঠিত এবং অত্যন্ত সম্মানিত , যদিও প্রায় 4500 হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর পুত্র (আঃ) কর্তৃক এর নির্মাণের পর বহু বছর অতিবাহিত হয়েছে। অগণিত মানুষ বহু শতাব্দী ধরে মহান দুর্গ, প্রাসাদ এবং সাম্রাজ্য তৈরি করেছে তবুও তাদের বেশিরভাগই বিবর্ণ হয়ে গেছে এবং সমাজের দ্বারা খুব কমই মনে রাখা হয়েছে। এমনকি যারা এগুলো নির্মাণ করেছেন তারাও ইতিহাসে পাদটীকা হয়ে আছেন।

মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য যে কাজ করা হয়েছে তা শুধু টিকে থাকে না, এমনকি যারা কাজ করেছেন তাদেরও স্মরণ করা হয়, যেমন মহানবী ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর পুত্র সালাম। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রচেষ্টাকে এতটাই সম্মানিত করেছেন যে, পাথরের পিছনে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম দাঁড়িয়ে প্রার্থনা না করে কেউ ওমরা নামে পরিচিত এবং পবিত্র তীর্থযাত্রা, যা হজ নামে পরিচিত, পরিদর্শনও সম্পূর্ণ করতে পারে না। মহান আল্লাহর ঘর নির্মাণের সময়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 125:

"...এবং, [হে ঈমানদারগণ], ইব্রাহিমের দাঁড়ানো স্থান থেকে প্রার্থনার স্থান গ্রহণ কর..."

সমস্ত জাগতিক প্রচেষ্টা অবশেষে ম্লান হয়ে যাবে। তারা হয়তো এই পৃথিবীতে সাময়িকভাবে মানুষের উপকার করতে পারে কিন্তু পরের দুনিয়ায় তাদের কোনো উপকারে আসবে না। প্রকৃতপক্ষে, যদিও তারা সেই প্রচেষ্টাগুলি এখনও পিছনে ফেলে দেবে, বিচারের দিন তাদের জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে। অন্যদিকে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিবেদিত প্রচেষ্টা উভয় জগতের একজন মুসলিমের জন্য উপকৃত হবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 96:

"তোমার যা আছে তা শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহর কাছে যা আছে তা চিরস্থায়ী..."

এই প্রচেষ্টাগুলি একটি সম্পূর্ণ মসজিদ নির্মাণের মতো বিশাল হতে হবে না। একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র তাদের শক্তি অনুযায়ী কাজ করতে হবে, যেমন একটি মসজিদ নির্মাণে অবদান রাখা। আন্তরিকতার সাথে কাজ করলে তাদের পুরস্কার কল্পনার বাইরে। এটি অনেক হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে , যেমন সহীহ মুসলিম, 2342 নম্বরে পাওয়া যায়। এই হাদিসটি পরামর্শ দেয় যে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটি খেজুর ফল দান করার মতো একটি ছোট প্রচেষ্টাও অনেক বেশি আশীর্বাদে পুরস্কৃত হবে। একটি পাহাড়ের চেয়ে আকার।

এই মহান ঘটনাটিও আন্তরিকতার গুরুত্ব নির্দেশ করে। শুরুতে উদ্‌ধৃত আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর পুত্র, শান্তি শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই উদ্দেশ্য করেছিলেন, যেহেতু তারা অবিলম্বে তাঁর কাছে তাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করার জন্য মিনতি করেছিলেন যাতে এটি স্পষ্ট হয় যে তাদের পবিত্র নিয়ত মহান আল্লাহর কাছে গোপন ছিল না।

এটা সব মুসলমানের জন্য একটি সুস্পষ্ট শিক্ষা যে তারা যখনই ভালো কাজ করে তখন তাদের উদ্দেশ্য ঠিক থাকে। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে, তাকে বিচারের দিন তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান পেতে বলা হবে, যা সম্ভব হবে না। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু এই মহান ঘটনা মহান আল্লাহর কাছে বিনয়ী হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাও দেয়। তাদের যা কিছু আছে বা তারা যে কোন সৎ কাজ করে তার জন্য কখনোই গর্ব করা উচিত নয়, কারণ এগুলো একমাত্র মহান আল্লাহর রহমতে সম্ভব। জ্ঞান, অনুপ্রেরণা, শক্তি এবং ভালো কাজ সম্পন্ন করার সুযোগ সবই মহান আল্লাহ প্রদত্ত। কোন কাজের উপর অহংকার করলে শুধু তার ধ্বংস নিশ্চিত হয় না বরং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ অহংকার থাকা অবস্থায় মারা যায় সে

জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সহীহ মুসলিম, 266 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন মুসলিমকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ সহজেই অন্য কাউকে ভালো কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে পারেন। অতএব, তাদের নম্রতা এবং কৃতজ্ঞতা দেখানো উচিত যে তারা নির্বাচিত হয়েছিল।

পরিশেষে, এই মহান ঘটনাটি শুধুমাত্র একটি ভাল কাজ করার গুরুত্বই নয় বরং মহান আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক কবুল হওয়ার গুরুত্বকে নির্দেশ করে, যাতে তারা পরকালে ও দুনিয়াতে পুরস্কার লাভ করে। এটি তখনই ঘটবে যখন একজন মুসলমান নিরাপদে সৎ কাজকে তাদের সাথে পরবর্তী পৃথিবীতে নিয়ে যায়। এটি 6 অধ্যায় আল আনআম, আয়াত 160 এ নির্দেশিত হয়েছে:

"যে ব্যক্তি [বিচারের দিনে] নেক আমল নিয়ে আসবে..."

এই আয়াতটি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে যে কেউ একটি ভাল কাজের অর্থ নিয়ে আসবে, বিচার দিবসে, তাকে পুরস্কৃত করা হবে। এটি ঘোষণা করে না যে যে ব্যক্তি একটি কাজ করবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের কাজগুলোকে তাদের অহংকার মতো খারাপ বৈশিষ্ট্য থেকে রক্ষা করতে হবে যা তাদের ধ্বংস করতে পারে। এর জন্য একজন মুসলিমকে ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করতে হবে যাতে তাদের মধ্যে থাকা খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো দূর করা যায় যা তাদের ভালো কাজগুলো যেমন হিংসা-বিদ্বেষের মতো ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। সুনানে ইবনে মাজা, 4210 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

পরিশেষে, একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, আল্লাহর ঘর, মহান, কাবা, কেবল যে দিকে তারা দিনে পাঁচবার নামাজের সময় মুখ করে থাকে তা নয় বরং এটি প্রতিনিধিত্ব করে যে কীভাবে একজন মুসলমানকে সর্বদা তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। , সারা দিন এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতে। এটি তখনই সম্ভব যখন কেউ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে। কাবা প্রকৃতপক্ষে এটিই ইব্রাহীম (আঃ) এর উত্তরাধিকার। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 79:

নিজের] দিকে ফিরিয়ে নিয়েছি যিনি নভোমন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সত্যের দিকে ঝুঁকে পড়েছি এবং আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে।"

তিনি পবিত্র তীর্থযাত্রা

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে আলে ইমরান, 97 নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

"...এবং [কারণে] মানুষের পক্ষ থেকে আল্লাহর জন্য গৃহের হজ্ব - যে ব্যক্তি সেখানে একটি পথ খুঁজে পেতে সক্ষম হয়..."

পবিত্র তীর্থযাত্রা প্রতিটি মুসলিম, যারা মানদণ্ড পূরণ করে, তাদের জীবনে অন্তত একবার অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে পবিত্র তীর্থযাত্রার আসল উদ্দেশ্য হল মুসলমানদেরকে তাদের পরকালের শেষ যাত্রার জন্য প্রস্তুত করা। যেভাবে একজন মুসলমান পবিত্র তীর্থযাত্রা করার জন্য তাদের বাড়ি, ব্যবসা, সম্পদ, পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সামাজিক মর্যাদা রেখে যায়, এটি তাদের মৃত্যুর সময় ঘটবে, যখন তারা তাদের আখিরাতে শেষ যাত্রা করবে। প্রকৃতপক্ষে, জামি আত তিরমিযী, 2379 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তির পরিবার এবং সম্পদ তাদের কবরে পরিত্যাগ করে এবং শুধুমাত্র তাদের ভাল-মন্দ কাজগুলি তাদের কবরে নিয়ে যায়।

যখন একজন মুসলমান তাদের পবিত্র তীর্থযাত্রার সময় এটি মনে রাখে তখন তারা এই দায়িত্বের সমস্ত দিক সঠিকভাবে পালন করবে। এই মুসলিম একটি পরিবর্তিত ব্যক্তি হিসাবে দেশে ফিরে আসবে, কারণ তারা এই জড় জগতের অতিরিক্ত দিকগুলিকে একত্রিত করার চেয়ে পরকালের জন্য তাদের চূড়ান্ত যাত্রার প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেবে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে তারা এটি অর্জন করবে। এর মধ্যে রয়েছে অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য দুনিয়া থেকে নেয়া।

মুসলমানদের পবিত্র তীর্থযাত্রাকে ছুটির দিন এবং কেনাকাটা করার জায়গা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়, কারণ এটি এর উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে। এটা অবশ্যই মুসলমানদের পরকালে তাদের শেষ যাত্রার কথা মনে করিয়ে দেবে। এমন একটি যাত্রা যার কোনো ফেরত নেই এবং দ্বিতীয় কোনো সুযোগ নেই। শুধুমাত্র এটিই একজনকে পবিত্র তীর্থযাত্রা সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে এবং পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে অনুপ্রাণিত করবে।

হযরত ইউসুফ (আঃ) এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

পরবর্তী যে মহান ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা করা হবে তা হল হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের মহান ঘটনা। তাঁর গল্পটি পবিত্র কুরআন জুড়ে ব্যাপকভাবে আলোচিত এবং মুসলমানদের কাছে খুব পরিচিত।

শেখার প্রথম পাঠটি হ'ল কারও প্রতি তাদের হিংসা বা অপছন্দকে কখনই তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বা ক্ষতি করতে চালিত হতে দেওয়া উচিত নয়। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইদের তাঁর প্রতি যে হিংসা ছিল, তা তাদেরকে তাঁর ক্ষতি করতে উৎসাহিত করেছিল। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 10:

"তাদের মধ্যে একজন বক্তা বললেন, "ইউসুফকে হত্যা করো না, বরং তাকে কূপের তলায় ফেলে দাও; কিছু পথিক তাকে তুলে নেবে - যদি তুমি [কিছু] করতে।"

এই মানসিকতা কেবল একজনকে অন্য অনেক পাপের দিকে চালিত করে, যার মধ্যে কয়েকটি এই মহান ঘটনায় উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এটি তাদেরকে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর শারীরিক ক্ষতি করতে, তাদের পিতার সাথে মিথ্যা বলার এবং তাদের পরিবারের সাথে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। একজন মুসলিম যে অন্যদের প্রতি অপছন্দ বোধ করে তার উচিত সর্বদা তা বাহ্যিকভাবে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা এবং অন্তরে এই নেতিবাচক অনুভূতিকে প্রতিহত করা। বরং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং তিনি ছাড়া অন্য কারো কাছে পুরস্কার চাওয়ার জন্য তাদের

উচিত সেই ব্যক্তির অধিকার আদায়ের চেষ্টা করা। এটা আশা করা যায় যে কেউ এমন আচরণ করে অন্য কাউকে অপছন্দ করার জন্য শাস্তি দেওয়া হবে না , কারণ তারা তাদের অনুভূতিতে কাজ করেনি।

শেখার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে একজনকে কখনই একটি মন্দ কাজ করার ষড়যন্ত্র করা উচিত নয়, কারণ এটি সর্বদা, একটি না কোন উপায়ে, তাদের উপর পাল্টা আঘাত করবে। এমনকি যদি এই পরিণতিগুলি পরবর্তী বিশ্বে বিলম্বিত হয় তবে তারা শেষ পর্যন্ত তাদের মুখোমুখি হবে। এমতাবস্থায় হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়েরা তাঁর পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও স্নেহ কামনা করে তাঁর ক্ষতি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে তাদের ষড়যন্ত্র তাদেরকে তাদের আকাঙ্ক্ষা থেকে আরও দূরে সরিয়ে দিয়েছে। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 18:

“এবং তারা তার শার্টের উপর মিথ্যা রক্ত নিয়ে এসেছিল। [জ্যাকব] বললেন, "বরং, তোমার আত্মা তোমাকে কিছুতে প্ররোচিত করেছে, তাই ধৈর্য্য সবচেয়ে উপযুক্ত..."

একজন যত বেশি মন্দ ষড়যন্ত্র করবে, মহান আল্লাহ তাদের লক্ষ্য থেকে তত বেশি দূরে সরিয়ে দেবেন। এমনকি যদি তারা বাহ্যিকভাবে তাদের ইচ্ছা অর্জন করে, মহান আল্লাহ, তারা যে জিনিসটি চেয়েছিলেন তা উভয় জগতে তাদের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবেন যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ শুধুমাত্র উভয় জগতে তাদের জন্য মানসিক চাপ ও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। একজন ব্যক্তির ভাল বা মন্দ যে কোনও পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ভুলে যাওয়া উচিত নয়, আসলে কিছু ধরণের মানসিক শান্তি অর্জন করা। এমনকি যদি পরিকল্পনাটি বিভিন্ন রূপ নেয়, তবে চূড়ান্ত লক্ষ্য এখনও একই। একজন ড্রাগ লর্ড সম্পদ এবং ক্ষমতা পাওয়ার

জন্য একটি সাম্রাজ্য তৈরি করে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে এই জিনিসগুলি তাদের জন্য মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। কিন্তু মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে এই চূড়ান্ত লক্ষ্য কখনোই অর্জিত হবে না, যদিও তারা সম্পদ ও ক্ষমতার মতো উপায়-উপকরণ পায়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

এবং অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 43:

"...কিন্তু মন্দ চক্রান্ত তার নিজের লোক ছাড়া ঘিরে রাখে না। তাহলে কি তারা পূর্ববর্তী লোকদের পথ [অর্থাৎ ভাগ্য] ছাড়া অপেক্ষা করে?

হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর ধৈর্য্য

পরবর্তী যে মহান ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা করা হবে তা হল হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের অবিচল মনোভাব। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 18:

“এবং তারা তার শার্টের উপর মিথ্যা রক্ত নিয়ে এসেছিল। [জ্যাকব] বললেন, "বরং, তোমার আত্মা তোমাকে কিছুতে প্ররোচিত করেছে, তাই ধৈর্য্য সবচেয়ে উপযুক্ত। আর তুমি যা বর্ণনা করছ তার বিরুদ্ধে আল্লাহই সাহায্য চান।"

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল এই আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ) জানতেন যে তাঁর পুত্ররা তাদের ভাই হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে, তথাপি তিনি স্পষ্টভাবে তাদের প্রকাশ করেননি। আচরণ এবং পরিবর্তে এটি গোপন করতে বেছে নিয়েছে, আশা করে যে তারা অবশেষে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হবে। এ থেকে একজন মুসলমানের অন্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করার গুরুত্ব বোঝা উচিত। সুনানে ইবনে মাজাহ, 225 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস উপদেশ দেয় যে, মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তির দোষ গোপন করবেন দুনিয়া ও আখিরাতে যখন তারা অন্যের দোষ গোপন করবে। সুনানে ইবনে মাজাহ 2546 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিস সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করবে তার দোষগুলো প্রকাশ করা হবে।

উপরন্তু, অন্যের দোষ গোপন করা, বিশেষ করে যখন পাপী জানে যে তাদের দোষ গোপন করা হয়েছে, তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে, প্রকাশ্যে একজন পাপীকে অপমান করা,

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, একজনকে আন্তরিক অনুতাপ থেকে আরও দূরে সরে যেতে বাধ্য করবে। প্রকৃতপক্ষে, রাগ তাদের সেই ব্যক্তির প্রতি প্রতিশোধ নিতে চালিত করতে পারে যে তাদের দোষ প্রকাশ করেছে, যা কেবলমাত্র আরও পাপের দিকে নিয়ে যায়।

উপরন্তু, হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর কাছে তাদের বিরুদ্ধে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ না থাকায় তিনি ফলাফল মেনে নিতে বাধ্য হন।

এই মহান অনুষ্ঠানে অবশিষ্ট রোগীর গুরুত্বও তুলে ধরা হয়েছে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, সত্যিকারের ধৈর্য সেই নয় যখন একজন অবশেষে, সময়ের সাথে সাথে, মেনে নেয় যে তার অপছন্দের কিছু ঘটেছে, যেমন প্রিয়জনের মৃত্যু। এটি সত্য ধৈর্য নয়, এটি কেবল গ্রহণযোগ্যতা, যা এমনকি সবচেয়ে অধৈর্য মানুষের কাছেও ঘটে। এই আয়াত দ্বারা প্রকৃত ধৈর্য দেখানো হয়েছে এবং সহীহ বুখারি, 1302 নম্বরে পাওয়া পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটি পরামর্শ দেয় যে সত্যিকারের ধৈর্য একটি অসুবিধার শুরুতে দেখানো হয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, যে কষ্টের শুরুতে অধৈর্যতা দেখায় এবং পরে তা মেনে নেয় সে প্রকৃত ধৈর্যশীল নয়। ধৈর্যের মধ্যে রয়েছে নিজের কাজ বা কথাবার্তার মাধ্যমে অভিযোগ এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখা। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা এর সাথে জড়িত।

এই মহান ঘটনাটি বোঝার গুরুত্ব নির্দেশ করে যে ধৈর্যশীল হওয়ার মতো কোনো ভালো কাজ মহান আল্লাহর রহমত ছাড়া ঘটতে পারে না। জ্ঞান, অনুপ্রেরণা, শক্তি এবং একটি ভাল কাজ করার সুযোগ যেমন ধৈর্য দেখানো, মহান আল্লাহর

কাছ থেকে আসে। এটি মনে রাখা অহংকার মারাত্মক খারাপ বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে।

পরিশেষে, এই ঘটনাটিও ইঙ্গিত করে যে একজন ব্যক্তি কেবলমাত্র তাদের অসুবিধার মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে পরিচালিত হবে, যাতে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে একটি অগণিত পুরস্কার লাভ করে। বর্ধিতভাবে, কেউ কেবলমাত্র স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং আশীর্বাদ লাভ করবে , যখন তারা মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। এর মধ্যে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা জড়িত। যারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বজায় রাখে, তাকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে সহায়তা প্রদান করা হবে যাতে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করে। তালাকে অধ্যায় 65, আয়াত 2-3:

"এবং যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন। এবং তাকে এমন রিজিক দেবেন যেখান থেকে সে আশাও করে না। আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট..."

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অটল হযরত ইউসুফ (আঃ)

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে 12 অধ্যায় ইউসুফ, আয়াত 24 এ উল্লেখ করা হয়েছে:

"এবং সে অবশ্যই তাকে [প্ররোচিত করার] সংকল্প করেছিল এবং সে তার প্রতি ঝুঁকে যেত যদি সে তার প্রভুর প্রমাণ [অর্থাৎ নিদর্শন] না দেখত। আর এভাবেই আমরা তার থেকে মন্দ ও অশ্লীলতাকে দূরে রাখি। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন আমাদের খাঁটি বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।"

এই আয়াতটি মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে যখনই তারা শয়তান বা মানুষ পাপের জন্য প্রলুব্ধ হয়, তখনই মহান আল্লাহকে স্মরণ করার মাধ্যমে তাদের উচিত হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা। মহান আল্লাহ তায়ালার সর্বব্যাপী দৃষ্টিকে স্মরণ করা, একজনকে পাপ কাজ থেকে দূরে সরে যেতে উৎসাহিত করতে পারে, তাদের মনে করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে যে অন্য কেউ তাদের না দেখলেও, মহান আল্লাহ অবশ্যই করেন। উপরন্তু, মহান আল্লাহ শুধু তাদের পর্যবেক্ষণই করেন না বরং তাদের জবাবদিহি করবেন এমন দিনে যা অনিবার্য। পবিত্র কুরআনে এই মনোভাবের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 201:

"নিশ্চয়ই, যারা আল্লাহকে ভয় করে - শয়তানের প্ররোচনা যখন তাদের স্পর্শ করে, তখন তারা [তাকে] স্মরণ করে এবং সাথে সাথে তাদের অন্তর্দৃষ্টি হয়।"

এই মহান ঘটনাটি মুসলমানদেরকে উপদেশ দেয় যে তারা এমন স্থান এবং লোকদের এড়িয়ে চলা উচিত যা তাদের পাপের দিকে আমন্ত্রণ জানায়। তাদের উচিত হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের মত আচরণ করা, যখন তিনি সেই মহিলার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন যে তাকে পাপের দিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল এবং যে স্থান থেকে পাপ সংঘটিত হওয়ার কথা ছিল। পরিবেশ এবং সঙ্গী সবসময় একজনের আচরণের উপর বিশাল প্রভাব ফেলবে। এ কারণেই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, একজন ব্যক্তি তাদের বন্ধুর ধর্মে রয়েছে। অর্থ, তারা তাদের সঙ্গীদের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করবে। তাই মুসলমানদের উচিত সেই স্থান ও লোকদের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা যারা তাদেরকে গুনাহের দিকে আমন্ত্রণ জানায় এবং পরিবর্তে তাদের সাহচর্য খোঁজে যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে আমন্ত্রণ জানায় এবং এই পৃথিবীতে বৈধ পথে সফল হওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে।

এই মহান ঘটনাটি মুসলমানদেরকে এও শিক্ষা দেয় যে, তারা যদি মহান আল্লাহর আনুগত্যে আন্তরিকভাবে সংগ্রাম করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে, তাহলে শান্তি ও বরকত বর্ষিত হবে। তাকে, মহান আল্লাহ তাদেরকে ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন। মানুষ নিখুঁত নয়, তারা ভুল করবে। অতএব, এই সুরক্ষার মধ্যে রয়েছে আন্তরিক অনুশোচনার প্রতি মহান আল্লাহর নির্দেশনা। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা অনুভব করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যাদের উপর অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়, একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং যে কোনও অধিকার আদায় করে নেওয়া। আল্লাহ, মহান, এবং মানুষের সম্মান লঙ্ঘন করা হয়েছে. সুনানে ইবনে মাজা, 4251 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এইভাবে মহান আল্লাহর দিকে ফিরে আসা সর্বোত্তম ধরণের মানুষের একটি বৈশিষ্ট্য।

নো কম্প্রোমাইজিং অন ফেইথ

পরবর্তী যে মহান ঘটনাটি আলোচনা করা হবে তাতে আপস না করে নিজের বিশ্বাসের উপর অবিচল থাকার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 33:

"তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, তারা আমাকে যে দিকে আহবান করে তার চেয়ে কারাগার আমার পছন্দের বেশি। এবং যদি আপনি তাদের পরিকল্পনাকে আমার থেকে বিরত না করেন, তবে আমি তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ব এবং [এভাবে] অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।"

হযরত ইউসুফ (আঃ) পাপ করার পরিবর্তে কারাগারে যাওয়া বেছে নিয়েছিলেন। মহানবী (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামের মত বিশাল ত্যাগ স্বীকারের আশা মুসলমানদের কাছ থেকে করা হয় না, তবে তাদের মানুষের স্বার্থে বা পার্থিব জিনিস লাভের জন্য তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করা উচিত নয়। . এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তি তার বিশ্বাসের সাথে আপস করার মাধ্যমে যে পার্থিব সাফল্য অর্জন করুক না কেন অবশেষে এই সাফল্য উভয় জগতে তাদের জন্য অভিশাপ এবং বড় বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। এটা বেশ স্পষ্ট হয় যখন কেউ মিডিয়া পর্যবেক্ষণ করে যে যারা তাদের নৈতিক মূল্যবোধ এবং বিশ্বাসের সাথে আপস করেছিল তারা যতই পার্থিব সাফল্য অর্জন করুক না কেন তারা দুঃখিত এবং হতাশাগ্রস্ত হয়েছিল। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

অতএব, একজন মুসলমানের বরং ইসলামের শিক্ষার উপর অবিচল থাকা উচিত এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত, শীঘ্রই বা পরে, তারা তাদের প্রত্যাশার বাইরে পার্থিব সাফল্যে ধন্য হবে, পরবর্তী পৃথিবীতে তাদের জন্য যে আশীর্বাদ অপেক্ষা করছে তা ছেড়ে দিন। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এবং অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 30:

"নিশ্চয়ই যারা বলেছে, "আমাদের রব আল্লাহ" অতঃপর সঠিক পথে রয়ে গেছে, তাদের উপর ফেরেশতারা অবতীর্ণ হবেন, [বলবেন], "ভয় পেও না এবং দুঃখ করো না বরং জান্নাতের সুসংবাদ পাও। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।"

উপরন্তু, এই মহান ঘটনাটি মুসলমানদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে তাদের নিজেদের শক্তির মাধ্যমে অবিচল থাকার ক্ষমতা অর্জিত হয় বলে বিশ্বাস করে অহংকার এড়াতে। মহান আল্লাহর হেদায়েত ও করুণা ছাড়া এটা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে, একটি সৎ কাজ করা বা পাপ থেকে বিরত থাকা মহান আল্লাহর রহমত, অনুপ্রেরণা, শক্তি, জ্ঞান ও সুযোগ ব্যতীত সম্ভব নয়। এটি একজনকে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে অনুপ্রাণিত করবে, যখনই তারা পার্থিব বা ধর্মীয় সাফল্য অর্জন করবে। এই কৃতজ্ঞতার সাথে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া সাফল্য ব্যবহার করা জড়িত। এটি উভয় জগতের আরও আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

অবশেষে, এই মহান ঘটনাটি অন্যদের খারাপ কাজে সাহায্য না করার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে, তারা যেই হোক না কেন। বরং মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে ভালো ও উপকারী কাজে সাহায্য করা এবং কে তাদের দায়িত্বে আছে বা অন্য কে তাদের মধ্যে অংশ নিচ্ছে সেদিকে খেয়াল না রাখা উচিত। অপরিচিত ব্যক্তি করলেও ভালোকে সমর্থন করা উচিত এবং মন্দ কাজগুলোকে এড়িয়ে চলা উচিত এবং তার বিরুদ্ধে উপদেশ দেওয়া উচিত, এমনকি যদি কোনো প্রিয়জন তা করে থাকে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

ভাল উপর অবিচল

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে 12 অধ্যায় ইউসুফ, 53 নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

“এবং আমি নিজেকে খালাস করি না। প্রকৃতপক্ষে, আত্মা একটি অবিরাম মন্দ কাজের আদেশকারী, আমার পালনকর্তা রহমত ব্যতীত। নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

লক্ষণীয় প্রথম জিনিসটি হল যে একজন মুসলমানের নিজের প্রতি পবিত্রতা এবং তাকওয়াকে দায়ী করা উচিত নয়, কারণ এটি ইঙ্গিত করতে পারে এবং গর্বিত হতে পারে। সত্য স্বীকার করা দাসত্ব ও নম্রতার কাছাকাছি: যে কোন ভালো জিনিস শুধুমাত্র মহান আল্লাহর রহমত ও নির্দেশনার মাধ্যমেই পাওয়া যায়। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 32:

"...সুতরাং নিজেদেরকে শুদ্ধ বলে দাবি করো না; কে তাকে ভয় করে সে সম্পর্কে তিনিই সবচেয়ে বেশি জানেন।"

উপরন্তু, এই মহান ঘটনাটি বোঝার গুরুত্ব তুলে ধরে যে বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ শয়তানগুলি সর্বদা একজন ব্যক্তিকে বিপথগামী করতে অবিরত থাকবে। অতএব, একজন মুসলমানকে মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক

আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে এই উভয় শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে । তাকে। এ কারণেই একজন মুসলিম কেবল জিহ্বা দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে না এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করতে ব্যর্থ হয়। যে এমন আচরণ করবে সে সহজেই এই শত্রুদের কাছে পরাজিত হবে। এই শত্রুদের পরাস্ত করার জন্য বাধ্যতামূলক অধ্যবসায় প্রয়োজন। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ কয়েক ঘণ্টায় বা সপ্তাহের এক দিনে একত্রিত না হয়ে সারা দিনে ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম কারণ। এই মনোভাব মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকার বিরোধী।

উপরন্তু, এই ঘটনাটিও ইঙ্গিত করে যে একজন মুসলমানকে সারাদিন ধরে চলতে হবে, ঠিক যেমন তাদের শত্রুরা তাদের বিরুদ্ধে সারাদিন ধরে থাকে। এটি কেবলমাত্র দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মতো একজনের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই নয়, বরং সারাদিন পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর আমল করার মাধ্যমে অর্জন করা হয়। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলি প্রদত্ত হয়েছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এই অবিরাম আনুগত্য একজন মুসলমানকে এই শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করবে এবং উভয় জগতের মানসিক ও শরীরের শান্তির দিকে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এ কারণেই মহান আল্লাহ তায়ালা জোর দিয়েছেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের প্রতিটি দিকই সকল মুসলমানের অনুসরণীয় আদর্শ। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 21:

"অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম নমুনা তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে এবং [যে] বারবার আল্লাহকে স্মরণ করে।"

দৈনন্দিন জীবনে তার আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমেই একজন মুসলিম মহান আল্লাহর রহমতে এই দুই শত্রুকে পরাস্ত করতে পারে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

হযরত ইউসুফ (আঃ) ক্ষমা করেন

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে 12 অধ্যায় ইউসুফ, আয়াত 92 এ উল্লেখ করা হয়েছে:

"তিনি বললেন, "আজ তোমার উপর কোন দোষ থাকবে না। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন এবং তিনি করুণাময়দের মধ্যে সবচেয়ে দয়ালু।"

এই শ্লোকটি গ্রহণ করার জন্য একটি অবিশ্বাস্যভাবে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছে: যখন কেউ অসুবিধার সম্মুখীন হয়, বিশেষ করে মানুষের কাছ থেকে অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন সহনশীল হওয়া। একজনের কখনই মন্দের জবাব মন্দ দিয়ে দেওয়া উচিত নয়, কারণ এটি একজন সফল মুসলিমের আচরণের বিরোধিতা করে। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 34:

"এবং ভাল কাজ এবং মন্দ সমান নয়। যা উত্তম তার দ্বারা [মন্দকে] প্রতিহত করুন; আর তখন যার সাথে তোমার শত্রুতা, সে যেন একজন একনিষ্ঠ বন্ধু।"

ভালোর সাথে ভালোর জবাব দেওয়া বিশেষ কিছু নয়, যেমন পশুরাও দয়ার বিনিময়ে দয়া দেখায়। বিশেষত মন্দের জবাবে ভালো দেখানো, বিশেষ করে যখন একজন ব্যক্তি প্রতিশোধ নেওয়ার অবস্থানে থাকে, ঠিক যেমন হযরত ইউসুফ (আঃ) ছিলেন। বাস্তবে, এই ইতিবাচক পদ্ধতিতে আচরণ করা নিজেকে

উপকৃত করে, কারণ যে ব্যক্তি জিনিসগুলি ছেড়ে দিতে শিখে এবং অন্যকে ক্ষমা করে, মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

প্রকৃতপক্ষে, এই মহান ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত, জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে ক্ষমা করবে, মহান আল্লাহ তাকে সম্মানিত করবেন।

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যদের ক্ষমা করার অর্থ এই নয় যে একজনকে অতীতকে উপেক্ষা করতে হবে, কারণ এটি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারে। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সহীহ বুখারী, 6133 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুমিনকে একই গর্তে দুবার দংশন করা যায় না। পরিবর্তে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একজনকে অন্যকে ক্ষমা করা উচিত এবং সেই ব্যক্তির সাথে আবার আচরণ করার ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া উচিত, যাতে তারা ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার পূরণ অব্যাহত রেখে নিজেকে একটি দুর্বল অবস্থানে ফেলে না দেয়।

উপরন্তু, এই মহান ঘটনা ইঙ্গিত করে যে একজন ব্যক্তির বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তারা তাদের ক্ষমা করেছে তাদের থেকে তারা উচ্চতর। প্রকৃতপক্ষে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই ব্যক্তি যাকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করেছেন। যে ব্যক্তি এই ধরণের অহংকার অবলম্বন করে এবং এটি নিয়ে পরকালে পৌঁছে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, সুনানে ইবনে মাজা, 4174 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়।

পরিশেষে, এই মহান ঘটনাটি ইঙ্গিত দেয় যে একজন ব্যক্তি কখনই মহান আল্লাহর রহমত থেকে আশা হারাবেন না। যতক্ষণ একজন মুসলিম আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং ভাল হওয়ার চেষ্টা করে, ততক্ষণ তাদের ক্ষমার আশা করা উচিত। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা অনুভব করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যাদের উপর অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়, একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং যে কোনও অধিকার আদায় করে নেওয়া। আল্লাহ, মহান, এবং মানুষের সম্মান লঙ্ঘন করা হয়েছে. কিন্তু একজন মুসলিমের পরিবর্তনের চেষ্টা না করে পাপ করা চালিয়ে যাওয়া উচিত নয় এবং তারপরও মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন বলে আশা করা উচিত, কারণ এটি আশা নয়, এটি নিছক ইচ্ছাপ্রসূত চিন্তা, যার ইসলামে কোনো মূল্য নেই। জামি আত তিরমিযী, ২৪৫৯ নং হাদিসে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মুসা (সাঃ) এর মাতা

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে তা হল হযরত মুসা (আঃ) এর কাহিনী। পবিত্র কুরআন জুড়ে তার কাহিনী ব্যাপকভাবে পরিচিত এবং বিস্তারিতভাবে আলোচিত। উদাহরণ স্বরূপ, 28 অধ্যায় আল কাসাস, 7 নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে কিভাবে নবী মুসা (আঃ)-এর মা তাকে শৈশবকালে ফেরাউনের সৈন্যদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

"আর আমরা মূসার মায়ের কাছে ওহী পাঠালাম, "তাকে স্তন্যপান কর; কিন্তু যখন তুমি তার জন্য ভয় পাবে, তখন তাকে নদীতে ফেলে দাও এবং ভয় করো না এবং দুঃখ করো না, অবশ্যই, আমরা তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে [একজন] করব। রসূলদের।"

এই আয়াতটি মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত আস্থা দুটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। প্রথমটি হল ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মহান আল্লাহ প্রদত্ত বৈধ উপায় ব্যবহার করা। দ্বিতীয় উপাদানটি হল বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহ যে ফলাফলটি বেছে নেবেন তা জড়িত প্রত্যেকের জন্য সর্বোত্তম হবে, এমনকি যদি একজন ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভাবে এর পেছনের প্রজ্ঞা লক্ষ্য না করে। মহানবী মূসা (আ.)-এর মাতা উভয় দিকই পূর্ণ করেছিলেন। তিনি পদক্ষেপ না নিয়ে তার বাড়িতে থাকেননি, মহান আল্লাহর উপর ভরসা রেখে তার ছেলেকে রক্ষা করবেন। তিনি শারীরিকভাবে তার কাছে থাকা বৈধ উপায় অনুযায়ী সংগ্রাম করেছিলেন এবং তারপর মহান আল্লাহর পরিকল্পনার উপর ভরসা করেছিলেন। মুসলমানদের কখনই চরম হওয়া উচিত নয় এবং একটি দিক ছাড়া অন্য দিকটি গ্রহণ করা উচিত নয়। উপায় ব্যবহার করা মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার একটি দিক,

কারণ উপায়গুলি মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তৈরি এবং সরবরাহ করেছেন। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 2517 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে কাউকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, তাদের উট বেঁধে তাদের কাছে থাকা উপায়গুলি ব্যবহার করার সাথে সাথে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার জন্য। উট রক্ষা করবে।

সামাজিক সুবিধা নিয়ে যাওয়া এবং মহান আল্লাহর উপর ভরসা দাবি করা ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী নয়। যারা এমন আচরণ করে তারা মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, শুধুমাত্র সরকারকে। এই আচরণ শুধুমাত্র গ্রহণযোগ্য যদি একজন ব্যক্তি সামাজিক সুবিধার অধিকারী হয়। একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের শারীরিক শক্তির মতো তাদের উপায়গুলি ব্যবহার করতে হবে এবং তারপরে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে, সর্বক্ষেত্রে তাদের জন্য সর্বোত্তম জিনিসটি প্রদান করবেন এবং চয়ন করবেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

মুসা (সাঃ) এর পরিবেশ

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 9 এ উল্লেখ করা হয়েছে:

"এবং ফেরাউনের স্ত্রী বললো, "[তিনি হবে] চোখের আরাম [অর্থাৎ, আনন্দের] আমার এবং আপনার জন্য, তাকে হত্যা করবেন না, সম্ভবত সে আমাদের উপকার করতে পারে, অথবা আমরা তাকে পুত্র হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। " এবং তারা বুঝতে পারেনি।"

এই মহান ঘটনাটি মহান আল্লাহর আনুগত্যে অটল থাকার গুরুত্বকে নির্দেশ করে, যে আশীর্বাদগুলি একজনকে দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করার মাধ্যমে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক, এমনকি যখন কেউ একটি অনৈসলামিক পরিবেশের মুখোমুখি হয়। হযরত মূসা (আঃ)-এর ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে জানা যায় যে, তিনি ফেরাউনের প্রাসাদে বেড়ে উঠেছিলেন। কেউ কল্পনা করতে পারে যে এখনও সেখানে যে কু-প্রথাগুলো সংঘটিত হয়েছিল, হযরত মূসা (আঃ) তাদের দ্বারা প্রভাবিত হননি এবং এখনও তাঁর সারা জীবন মহৎ চরিত্রে আবদ্ধ ছিলেন। যদিও, তিনি নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হওয়া থেকে ঐশ্বরিকভাবে সুরক্ষিত ছিলেন, মুসলমানদের অবশ্যই তার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। এই দিন এবং যুগে, মুসলিমরা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে এবং বিভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে একীভূত হয়েছে। যদিও, ইসলাম মুসলমানদেরকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি এবং মতামতকে সম্মান করতে শেখায়, তবুও তাদের অবশ্যই ইসলামের শিক্ষাগুলিকে মেনে চলতে হবে যা এর শিক্ষার বিপরীত রীতিনীতি গ্রহণ করে। দুর্ভাগ্যবশত, যেহেতু অনেক মুসলিম অন্যান্য সমাজের সাথে একীভূত হওয়ার সময় ইসলামের শিক্ষার উপর

অটল থাকেনি, তারা তাদের রীতিনীতি গ্রহণ করে এবং ইসলামের শিক্ষার সাথে এমনভাবে মিশ্রিত করে যে এই মুসলিমদের মধ্যে অনেকেই ইসলামী অনুশীলনের মধ্যে পার্থক্য জানেন না। এবং অ- ইসলামিক অনুশীলন। এই সত্যটি বোঝার জন্য একজনকে কেবল আধুনিক দিনের বেশিরভাগ মুসলিম বিবাহ পালন করতে হবে। হযরত মুসা (আঃ) যেভাবে তাঁর প্রাসাদে বেড়ে ওঠার সময় ফেরাউনের পরিবারের রীতিনীতি অবলম্বন করেননি, সেভাবে মুসলমানদের অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা মেনে চলতে হবে, তারা যেখানেই থাকুক না কেন। এই ছিল সাহাবীদের মনোভাব, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, যারা এখনও বিচিত্র দেশে ভ্রমণ করেছিলেন, সর্বদা ইসলামের শিক্ষা মেনে চলেছিলেন।

এটা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত, একজন মুসলমান যত বেশি অনৈসলামিক রীতিনীতি গ্রহণ করবে, তত কম তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর আমল করবে। এই মনোভাব শুধুমাত্র গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায়, কারণ মহান আল্লাহ শুধুমাত্র সেই কাজগুলোই কবুল করবেন যেগুলো হেদায়েতের এই দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত রয়েছে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 85:

ইসলাম] ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ ভক্তি ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম অন্বেষণ করে, তবে তা তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না: সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

মহানবী হযরত মুসা (সাঃ) এর আন্তরিকতা

পরবর্তী মহান ঘটনাটি যা আলোচনা করা হবে তা পবিত্র কুরআনের 24 নং আয়াত আল কাসাস অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে:

"অতএব তিনি তাদের জন্য [তাদের মেষপালকে] পানি দিলেন; তারপর সে ছায়ায় ফিরে গেল..."

এই মহান ঘটনাটি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে যা মুসলমানদের গ্রহণ করা উচিত। প্রথমটি হল, একজন মুসলিমকে সর্বদা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের সাহায্য করার প্রতিটি সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করে তাদের সৎ কাজগুলোকে ছোট করা উচিত নয়, শুধুমাত্র মুসলমানরা বড় সৎ কাজ করতে চায়। এই নেতিবাচক মনোভাব শয়তানের কৌশল যা মুসলমানদের এড়িয়ে চলতে হবে। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী প্রতিটি সৎ কাজই তাৎপর্যপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ মুসলিম, 2342 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে, মহান আল্লাহ তাকে একটি পর্বতের পরিমাণ পুরস্কার দেবেন যে তার সন্তুষ্টির জন্য একটি খেজুর ফলও দান করবে। ছোট আমলের তাৎপর্য নির্দেশকারী আরও অনেক হাদিস রয়েছে। এমনকি পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, প্রতিটি পরমাণুর ভালো মূল্য লিপিবদ্ধ করা হবে এবং পুরস্কৃত করা হবে। অধ্যায় 99 আয জালজালাহ, আয়াত 7:

"সুতরাং যে ব্যক্তি একটি অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।"

মুসলমানদের উচিত হজরত মুসা (আ.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যদের সাহায্য করা। সেই সময়ে তার শারীরিক শক্তি ছাড়া নারীদের অর্পণ করার আর কিছুই ছিল না, তাই তিনি এটিকে একটি ছোট এবং নগণ্য কাজ বলে বিশ্বাস করে কাজটিকে উপেক্ষা না করে তাদের সাহায্য করার জন্য ব্যবহার করেছিলেন।

উপরন্তু, এই মহান ঘটনাটি ছোট নেক আমলের তাৎপর্য প্রমাণ করে, কারণ এই কাজটি তাকে হযরত শোয়াইব (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাত ও বসবাসের দিকে পরিচালিত করে।

এই মহান অনুষ্ঠানে নির্দেশিত আরেকটি ভালো বৈশিষ্ট্য হল আন্তরিকতা। মহানবী মূসা (আঃ) তখনও বেপরোয়া অবস্থায় ছিলেন, তিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করার কারণে মহিলাদের কাছ থেকে অর্থ প্রদানের ইচ্ছা বা অনুরোধ করেননি। মুসলমানদের কখনই তারা অন্যদের প্রতি যে উপকার করে তার জন্য প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা বা অনুরোধ করা উচিত নয়, কারণ এটি তাদের অকৃতজ্ঞতার অর্থ প্রমাণ করে, তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করেনি। অকৃতজ্ঞতা কেবল সেই পুরস্কারকে নষ্ট করে যা একজন মহান আল্লাহর কাছ থেকে পেতে পারে। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুসা (সাঃ) এর দোয়া

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে আল কাসাস 24 নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

“অতএব তিনি তাদের জন্য [তাদের মেষপালকে] পানি দিলেন; অতঃপর তিনি ছায়ার দিকে ফিরে গেলেন এবং বললেন, হে আমার রব, নিশ্চয়ই আমি আছি, আপনি আমার কাছে যা কিছু নাযিল করবেন, অভাবগ্রস্ত হবেন।

মহানবী মুসা (আঃ) এর এই দোয়া মুসলমানদের নম্রতার গুরুত্ব শেখায়। এই ধার্মিক বৈশিষ্ট্য একজন মুসলমানকে তাদের হৃদয়ে এবং তাদের কর্মের মাধ্যমে স্বীকার করতে দেয় যে তাদের কাছে থাকা প্রতিটি আশীর্বাদ মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাদের দিয়েছেন। মহানবী মূসা (আঃ) এই দোয়ার মাধ্যমে নিশ্চিত করেছেন যে, দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ মহান আল্লাহ প্রদত্ত। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, যদিও এটা সত্য যে সৃষ্টির কোন কিছুই মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও পছন্দ ছাড়া ঘটে না, যার মধ্যে অসুবিধা ও কষ্টও রয়েছে, তবুও এসব মহান আল্লাহর প্রতি আরোপ না করাই প্রকৃত দাসত্বের লক্ষণ। অর্থ, মহানবী মূসা (আঃ) মহান আল্লাহ তাঁর জন্য মনোনীত ভালো জিনিসের কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু তিনি যে মহা অসুবিধার মধ্যে ছিলেন তা উল্লেখ করেননি, যা মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও পছন্দের মাধ্যমে ঘটেছিল। আচরণকে অভিযোগের ধরণ হিসাবে দেখা যেতে পারে। মহানবী ইব্রাহীম (আঃ) একই কাজ করেছিলেন যখন তিনি মহান আল্লাহর কাছে ভাল জিনিসগুলি আরোপ করেছিলেন, তবুও অসুস্থতার জন্য দায়ী করেছিলেন, যদিও অসুস্থতাগুলি কেবল মহান আল্লাহর পছন্দ এবং ইচ্ছার মাধ্যমে ঘটে। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 80:

"এবং যখন আমি অসুস্থ হই, তিনিই আমাকে সুস্থ করেন।"

এই মনোভাব গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি নেতিবাচক না হয়ে একজনের মানসিকতাকে ইতিবাচক করে তোলে। যে ব্যক্তি নেতিবাচক মানসিকতা অবলম্বন করে, সে কখনোই তাদের সমস্যাগুলো পর্যবেক্ষণ করবে এবং উল্লেখ করবে না বরং তাদের অগণিত আশীর্বাদগুলো পর্যবেক্ষণ করবে, যা অধৈর্যতা এবং আরও অসুবিধার দিকে নিয়ে যায়। যদিও, যে ব্যক্তি একটি ইতিবাচক মানসিকতার অধিকারী সে কেবলমাত্র সমস্ত পরিস্থিতিতে তাদের অগণিত আশীর্বাদগুলি পর্যবেক্ষণ এবং উল্লেখ করবে যা ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতার দিকে পরিচালিত করে। মহানবী হযরত মোলুসা আলাইহিস সালাম এই মহান ঘটনায় তা দেখিয়েছেন। এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা গুরুত্বপূর্ণ যে গ্লাসটি অর্ধেক পূর্ণ, অর্ধেক খালি নয়।

পরিশেষে, এই প্রার্থনা মুসলমানদেরকে নির্দিষ্ট পার্থিব জিনিসের জন্য জিজ্ঞাসা করা এড়াতে শেখায়, কারণ কেউ এটি উপলব্ধি না করেই কষ্টের জন্য জিজ্ঞাসা করতে পারে। একজনকে অবশ্যই তাদের চরম অদূরদর্শীতা এবং জ্ঞানের অভাবকে গ্রহণ করতে হবে, বিশেষ করে ভবিষ্যতের বিষয়ে। অধ্যায় 42 আশ শুরা, আয়াত 27:

"এবং আল্লাহ যদি তাঁর বান্দাদের জন্য [অতিরিক্ত] রিযিক প্রসারিত করতেন, তবে তারা সারা পৃথিবীতে অত্যাচার করত। কিন্তু তিনি [এটি] পরিমাণে নাযিল করেন যা তিনি চান। তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে অবগত ও সর্বদ্রষ্টা।"

এর পরিবর্তে একজনের উচিত হজরত মুসা (আ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করা এবং সাধারণভাবে কল্যাণ চাওয়া এবং আল্লাহ তায়ালার ওপর পূর্ণ ভরসা করা, যিনি প্রতিটি অনুষ্ঠানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কী দিতে হবে তা সর্বোত্তমভাবে জানেন। এই সঠিক মনোভাবটি 2 অধ্যায়ে আল বাকারাহ, 200-201 আয়াতেও নির্দেশিত হয়েছে:

"... আর মানুষের মধ্যে এমন কেউ আছে যে বলে, "আমাদের প্রভু, আমাদেরকে এই দুনিয়াতে দাও" এবং আখিরাতে তার কোন অংশ নেই। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন একজন আছে যে বলে, "আমাদের প্রভু, আমাদেরকে এতে দাও" দুনিয়া [যা] ভাল এবং আখিরাতে [যা] ভাল এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন"।

মহানবী হযরত মুসা (সাঃ) এর আবেগ

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে আল কাসাস 28 অধ্যায়ে, 31 নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এতে হযরত মুসা (আঃ) এর সাথে জড়িত:

"এবং [তাকে বলা হয়েছিল], "আপনার লাঠি নিক্ষেপ করুন।" কিন্তু যখন তিনি দেখলেন এটা একটা সাপের মতো কাঁপছে, তখন সে পালিয়ে গেল এবং ফিরে গেল না। [আল্লাহ বললেন], "হে মূসা, কাছে যাও এবং ভয় করো না, নিশ্চয়ই তুমি নিরাপদ।"

এই মহান ঘটনাটি নির্দেশ করে যে সীমার মধ্যে আবেগপ্রবণ হওয়া গ্রহণযোগ্য যখন বিভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় যেমন একটি কঠিন সময়ে দু: খিত হওয়া। পবিত্র নবী মুসা (আঃ) সাপ থেকে পালানোর মাধ্যমে একটি স্বাভাবিক উপায়ে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন এবং আবেগ প্রদর্শন করা মানুষের একটি অংশ বলে মহান আল্লাহ তায়ালার সমালোচনা করেননি। যতক্ষণ পর্যন্ত আবেগ ইসলামের সীমার মধ্যে থাকে ততক্ষণ তা দেখানো সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য। কঠিন পরিস্থিতিতে একজন মুসলমান রোবটের মতো কাজ করবে এমনটা কেউ আশা করে না। প্রতিটি পরিস্থিতিতে, একজন মুসলমানের উচিত একটি ভারসাম্য বজায় রাখা যাতে তারা ইসলামের সীমা অতিক্রম না করে তাদের আবেগের মাধ্যমে তাদের উত্তেজনা মুক্ত করে। এটি 57 অধ্যায় আল হাদিদ, আয়াত 23 এ নির্দেশিত হয়েছে:

"যাতে আপনি নিরাশ না হন যা আপনাকে এড়িয়ে গেছে এবং তিনি আপনাকে যা দিয়েছেন তার জন্য [অহংকারে] উল্লাস করবেন না। আর আল্লাহ সবাইকে প্রতারিত ও অহংকারী পছন্দ করেন না।

এই আয়াত কোন ব্যক্তিকে দুঃখী বা সুখী হতে নিষেধ করে না। তবে এটি একজনকে এই দুটি আবেগের মধ্যে চরম না হওয়ার পরামর্শ দেয়, যেমন শোক এবং উল্লাস, উভয়ই পাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

একজন মুসলমানের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে যতক্ষণ তারা এই সীমার মধ্যে থাকবে ততক্ষণ তারা সফলভাবে সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে উঠবে, উভয় জগতে পুরস্কার ও বরকত অর্জন করবে। এই মহান ঘটনার শেষে ইঙ্গিত করা হয়েছে যেখানে মহান আল্লাহ তার আনুগত্যকারীকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন। এই নিরাপত্তা স্বল্পমেয়াদে একজন মুসলমানের কাছে স্পষ্ট নাও হতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে এই দুনিয়ায় বা পরকালে প্রকাশ পাবে। চাবিকাঠি হল সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখা, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা একজনকে দেওয়া হয়েছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক।

ফেরাউনের বিরুদ্ধে দোয়া করা

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে ইউনূসের 10 অধ্যায়ে, 88-89 আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

"...হে আমাদের পালনকর্তা, তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দিন এবং তাদের অন্তরকে কঠিন করে দিন যাতে তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনে না। [আল্লাহ] বললেন, "তোমার দোয়া কবুল হয়েছে। সুতরাং তুমি সঠিক পথে থাক এবং যারা জানে না তাদের পথ অনুসরণ করো না।"

এই মহান ঘটনাটি মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে যদিও সম্পদ এবং কর্তৃত্ব ইসলামে নিষিদ্ধ নয়, যতক্ষণ না তারা প্রাপ্ত হয় এবং ব্যবহার করা হয় মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, কিন্তু যখন তারা তা পায় না, তারা সর্বদা তাদের মালিক এবং অন্যদের পথভ্রষ্ট করে। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, সম্পদ ও কর্তৃত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা একজন ব্যক্তির ঈমানের জন্য দু'জন ক্ষুধার্ত ধ্বংসের চেয়েও বেশি ধ্বংসাত্মক। নেকড়ে যা ভেড়ার পাল থেকে মুক্ত করা হয়েছে। ধন-সম্পদ ও কর্তৃত্ব চাওয়ার ন্যূনতম সীমা এই যে, তারা যেন কাউকে আল্লাহ, মহান বা সৃষ্টির প্রতি তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে বাধা না দেয় এবং তারা যেন তাদের যুলুমের মতো পাপ করতে উৎসাহিত না করে। যেহেতু নিজের প্রয়োজনের বাইরে এই দুটি জিনিস অর্জন করা এই সীমার মধ্যে অর্জন করা অত্যন্ত কঠিন, তাই একজন মুসলমানের জন্য কেবল তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য তালাশ করা নিরাপদ। যে ব্যক্তি এই দুটি জিনিসে লিপ্ত হয় এবং সীমা অতিক্রম করে তার উচিত এই আশীর্বাদগুলি হারানো এবং তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় নষ্ট করার বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত যাতে এটি শক্ত হয়ে

যায়। এই মহা আয়োজনে সতর্ক করা হয়েছে। এই আধ্যাত্মিক হৃদয় কিয়ামতের দিন নিরাপদ থাকবে না কারণ এটি অন্ধকারের দ্বারা সত্য নির্দেশনা থেকে অন্ধ হয়ে গেছে। সুনানে ইবনে মাজা, 4244 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, মহান আল্লাহর কাছ থেকে এই প্রার্থনার উত্তর, মুসলমানদের শেখায় যে তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্য মেনে চলতে হবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকতে হবে এবং ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করতে হবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এই আনুগত্য ব্যতীত একজনের কেবল প্রার্থনা করা উচিত নয়, কারণ এটি একটি সফল প্রার্থনার শিষ্টাচার এবং শর্তগুলির বিপরীত।

পরিশেষে, মহান আল্লাহর কাছ থেকে সাড়া মুসলমানদেরকে সতর্ক করে যে, প্রার্থনা না করার এবং তারপরে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার আশা করা, যেমন মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার জন্য সর্বোত্তম হলে সাড়া দেন। যে ব্যক্তি এই মনোভাবের কারণে দোয়া করা ছেড়ে দেয় তার দোয়া পূর্ণ হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩৩৮৭ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

মহানবী (সা.) ও সাগর

পরবর্তী যে মহান ঘটনাটি আলোচনা করা হবে তা আশ শুআরা 26 অধ্যায়ে, 62-63 আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

"[মূসা] বললেন, "না, আমার সাথে আমার প্রভু আছেন, তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।" অতঃপর আমি মূসার কাছে ওহী পাঠালাম, "তুমি তোমার লাঠি দিয়ে সাগরে আঘাত কর" এবং তা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং প্রতিটি অংশ একটি বিশাল উঁচু পর্বতের মতো হয়ে গেল।

মহানবী হযরত মুসা (আঃ) এর লোহিত সাগরকে বিভক্ত করার অলৌকিক ঘটনাটি সর্বজনবিদিত। এই মহান ঘটনাটি মুসলমানদের শিক্ষা দেয় যে যখনই তারা কোন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তখনই তাদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা, এই বিশ্বাস রেখে যে তিনি তাদের এ থেকে উত্তরণের পথ দেবেন, যদিও সেই সময়ে এটি অসম্ভব বলে মনে হয়, ঠিক যেমন তিনি করেছিলেন। হযরত মুসা (আঃ) এবং তাঁর জাতির জন্য। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 2:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তমটি বেছে নেন, যদিও তাঁর আদেশের পিছনে প্রজ্ঞা সুস্পষ্ট না হয়। এটি একজন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া যা হয় আশীর্বাদ বা মহান আল্লাহর ক্রোধের দিকে পরিচালিত করে। একজনকে কেবল তাদের নিজের জীবনের অগণিত উদাহরণগুলির প্রতিফলন করতে হবে যেখানে তারা বিশ্বাস করেছিল যে কিছু খারাপ ছিল শুধুমাত্র পরে তাদের মন পরিবর্তন করার জন্য এবং এর বিপরীতে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

এটি ঠিক এমনই হয় যখন একজন ব্যক্তি ডাক্তার দ্বারা নির্ধারিত তেতো ওষুধ খান। যদিও ওষুধটি তিক্ত, তবুও তারা এটি গ্রহণ করে বিশ্বাস করে যে এটি তাদের উপকার করবে। এটা আশ্চর্যের বিষয় যে একজন মুসলমান কীভাবে একজন ডাক্তারকে বিশ্বাস করতে পারে যার জ্ঞান সীমিত এবং যিনি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত নন যে তিক্ত ওষুধ তাদের উপকার করবে এবং মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করতে ব্যর্থ হবে, যার জ্ঞান অসীম এবং যখন তিনি কেবল তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তম নির্ধারণ করেন।

একজন মুসলিমের উচিত ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এবং মহান আল্লাহর উপর আস্থার মধ্যে পার্থক্য বোঝা। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্য করে না, এবং তারপর তার কাছে তাদের সাহায্যের আশা করে সে একজন ইচ্ছাপ্রবণ চিন্তাশীল। যিনি মহান আল্লাহর সাহায্য লাভ করবেন, যা এই মহান ঘটনায় ইঙ্গিত করা হয়েছে, তিনি সেই ব্যক্তি যিনি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করেন, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা,

তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী ধৈর্য্য ধরুন এবং তারপর তাঁর পছন্দের বিষয়ে অভিযোগ বা প্রশ্ন না করে তাঁর রায়ের উপর আস্থা রাখুন।

মহানবী (সা.) ও কৃতজ্ঞতা

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে আল বাকারাহ, 61 নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

"আর স্মরণ কর, যখন তুমি বলেছিলে, "হে মূসা, আমরা কখনোই এক ধরনের খাদ্য সহ্য করতে পারি না, সুতরাং তোমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর, যেন তিনি আমাদের জন্য পৃথিবী থেকে এর সবুজ শাকসবজি, এর শসা, এর রসুন, এর মসুর এবং ডাল বের করেন। এর পেঁয়াজ।" [মূসা] বললেন, "তুমি কি কম যা ভালো তার বিনিময়ে নেবে? [যেকোনো] মীমাংসার মধ্যে যাও এবং অবশ্যই তুমি যা চেয়েছ তাই পাবে।" এবং তারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যে আচ্ছন্ন ছিল এবং আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে ফিরে এসেছিল..."

একজন মুসলমানকে মহান আল্লাহ তায়ালা যা দিয়েছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে কখনই ব্যর্থ হওয়া উচিত নয়। হযরত মুসা (আঃ)-এর লোকদের মতই, আজকে অনেক মুসলিম বিশ্বাস করে যে তাদের কাছে যা আছে তা তারা যা পেতে চায় তার চেয়ে নিকৃষ্ট। অন্য কিছু কামনা করার জন্য তারা যেমন স্পষ্টতই ভুল ছিল, তেমনি আজ মুসলমানরাও। মহান আল্লাহ তায়ালার রীতি, তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বদা সর্বোত্তমটি বেছে নেওয়া এবং এটি তাদের উপর নির্ভর করে যে হয় প্রকৃত কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে তাদের নেয়ামত বৃদ্ধি করবে বা অকৃতজ্ঞতার মাধ্যমে মহান আল্লাহর শাস্তিকে আমন্ত্রণ জানাবে। মুসলমানদের মনে রাখা উচিত যে তারা অত্যন্ত অদূরদর্শী এবং তাদের আকাঙ্ক্ষার পরিণতি বোঝে না যেখানে মহান আল্লাহ প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তের সর্বোত্তম ফলাফল সহ সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ জানেন। একজন মুসলিমের মনে রাখা উচিত যে অনেকবার তারা বিশ্বাস করেছিল যে কিছু ভাল ছিল যখন

এটি আসলে খারাপ ছিল এবং এর বিপরীতে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

অতএব, মুসলমানদের উচিত আল্লাহ তায়ালার যে কোনো পছন্দের ব্যাপারে ধৈর্য ধরতে হবে। একজন মুসলিমেরও উচিত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপদেশ গ্রহণ করা, যা জামে আত তিরমিযী, 2513 নম্বরে পাওয়া যায়, যারা তাদের চেয়ে কম নিয়ামতের অধিকারী তাদের পালন করার পরিবর্তে যারা বেশি অধিকারী তাদের পর্যবেক্ষণ করে। এটি একজনকে অকৃতজ্ঞ হওয়া থেকে বিরত রাখবে।

সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা একজনের হৃদয়ের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয় যখন কেউ স্বীকার করে যে আশীর্বাদ মহান আল্লাহর কাছ থেকে আসে এবং এতে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ভালো কথা বলা বা নীরব থাকার মাধ্যমে এবং দোয়াগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে কাজের মাধ্যমে দেখানো হয়। এতে বরকত বৃদ্ধি পাবে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

জীবনকে কঠিন করে তোলা

পরবর্তী মহান ঘটনাটি আলোচনা করা হবে আল বাকারাহ, 68-71 নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

"তারা বলল, "আপনার প্রভুর কাছে ডাকুন যেন তিনি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দেন যে এটি কী ... "এখন আপনি সত্য নিয়ে এসেছেন।" তাই তারা তাকে হত্যা করেছিল, কিন্তু তারা খুব কমই করতে পারে।"

হযরত মুসা (আঃ) এর জাতি অনেক বেশি অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল, যা তাদের জন্য আরও অসুবিধার কারণ হয়েছিল। মুসলমানদের এই মানসিকতা অবলম্বন করা উচিত নয় কারণ যাদের অনেক বেশি প্রশ্ন করার অভ্যাস রয়েছে তারা প্রায়শই তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় এবং উপকারী জ্ঞান অর্জনে ব্যর্থ হয়, কারণ তারা কম গুরুত্বপূর্ণ এবং কখনও কখনও অপ্রাসঙ্গিক তথ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা এবং গবেষণায় ব্যস্ত থাকে। এই মানসিকতা একজনকে এই ধরণের বিষয় নিয়ে তর্ক ও বিতর্ক করতেও অনুপ্রাণিত করতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, এই মনোভাব আজ মুসলমানদের মধ্যে বেশ বিস্তৃত, কারণ তারা প্রায়শই তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে মনোনিবেশ না করে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের প্রতি মনোনিবেশ না করে বাধ্যতামূলক এবং কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তর্ক করে, সঠিকভাবে, অর্থা। , তাদের সম্পূর্ণ শিষ্টাচার এবং শর্তাবলীর সাথে তাদের পূরণ করা।

এই মহান ঘটনায় উল্লেখিত লোকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে এবং তাদের নিজেদের জীবনকে আরও কঠিন করে তুলবে। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, একমাত্র প্রাসঙ্গিক জ্ঞান হল সেই জ্ঞান যা বিচার দিবসে মহান আল্লাহ যা জিজ্ঞাসা করবেন তার সাথে সম্পর্কিত। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণিত ও আলোচনা করা হয়েছে। বিচার দিবসে অন্যান্য সমস্ত জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না এবং তাই অবশ্যই উপেক্ষা করা উচিত।

মহানবী হযরত মুসা (সাঃ) জ্ঞানের সন্ধান করেন

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 60 এ উল্লেখ করা হয়েছে:

"এবং [উল্লেখ করুন] যখন মূসা তার বালককে (অর্থাৎ, চাকরকে) বলেছিলেন, "আমি [ভ্রমণ] বন্ধ করব না যতক্ষণ না আমি দুই সমুদ্রের সংযোগস্থলে না পৌঁছাব বা দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকব।"

একজন মুসলমানের কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তারা খুব বেশি জ্ঞানের অধিকারী তাই তাদের আরও কিছু খোঁজার বা অর্জন করার দরকার নেই। উপরন্তু, তাদের বয়স, সামাজিক মর্যাদা বা অন্য কিছু নির্বিশেষে, কারও কাছ থেকে দরকারী জ্ঞান অর্জনে তাদের কখনই লজ্জিত হওয়া উচিত নয়। পবিত্র নবী মুসা (আঃ) হলেন একজন সর্বোচ্চ পদমর্যাদার নবী, শান্তি তাদের উপর, তবুও তিনি এমন একজনের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য যাত্রা করেছিলেন যিনি তার নিজের চেয়ে নিম্ন পদের অধিকারী ছিলেন। যে ব্যক্তি সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যখন এটি তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তারা জ্ঞান প্রদানকারীর চেয়ে উচ্চতর, স্পষ্টভাবে অহংকার গ্রহণ করেছে। এটি সহীহ মুসলিমের 265 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, এই একই হাদিসটি সতর্ক করে যে কাউকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি অণু পরিমাণ অহংকার যথেষ্ট।

দুর্ভাগ্যবশত, এই মনোভাব এই দিন এবং যুগে সাধারণত পরিলক্ষিত হয়, কারণ মুসলিমরা প্রায়শই তাদের থেকে ছোটদের দেওয়া পরামর্শ এবং জ্ঞানকে উপেক্ষা করে। এটি প্রায়শই পিতামাতার মধ্যে দেখা যায় যারা তাদের সন্তানদের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেন, দাবি করেন যে পিতামাতা সর্বদা ভাল জানেন। এই মহান ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত , একজন ব্যক্তি কখনই কারো কাছ থেকে সত্য গ্রহণ করতে লজ্জিত বা লজ্জিত হবেন না, এই সত্যটি পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয়ের সাথে যুক্ত হোক না কেন।

সহজ কথায়, যে মুসলিম বিশ্বাস করে যে তাদের অন্যের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন নেই, সে সত্যিকারের অজ্ঞ ব্যক্তি, যদিও তাদের অনেক জ্ঞান থাকে। অথচ, যে ব্যক্তি সামান্য জ্ঞানের অধিকারী, যার উপর তারা কাজ করে এবং সর্বদা যে কারো কাছ থেকে অধিক উপকারী জ্ঞান লাভের জন্য উন্মুক্ত থাকে, সে প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি।

পরিশেষে, একজনকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে কর্ম ছাড়া জ্ঞান মোটেই উপকারী নয়। কেউ তখনই উভয় জগতে উপকৃত হবে যখন তারা দরকারী জ্ঞান অর্জন করবে এবং তারপরে তার উপর কাজ করবে।

যেখানে মহানতা মিথ্যা

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে আল বাকারাহ, আয়াত 247 2 অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে:

"এবং তাদের নবী তাদের বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তালুতকে তোমাদের কাছে রাজা হিসেবে পাঠিয়েছেন।" তারা বলল, কিভাবে সে আমাদের উপর রাজত্ব করবে অথচ আমরা তার চেয়ে বেশি রাজত্বের যোগ্য এবং তাকে কোন পরিমাণ সম্পদ দেয়া হয়নি? তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে তোমার উপর মনোনীত করেছেন এবং তাকে জ্ঞান ও মর্যাদায় প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করেছেন..."

এই মহান ঘটনাটি মুসলমানদের মনে করিয়ে দেয় যে মহানতা এবং সত্যিকারের সাফল্য পার্থিব জিনিসের সাথে সম্পর্কিত নয়, যেমন সম্পদ বা খ্যাতি। একজন ব্যক্তি এসবের মাধ্যমে কিছু পার্থিব সাফল্য অর্জন করতে পারে কিন্তু ইতিহাসের পাতা উল্টালে এটা খুবই স্পষ্ট যে, এই ধরনের সাফল্য খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং তা শেষ পর্যন্ত একজন ব্যক্তির জন্য বোঝা ও অনুশোচনায় পরিণত হয়। একজন মুসলমানের কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে এই জিনিসগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে যার ফলে আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের কর্তব্য অবহেলা করে সেগুলি পাওয়ার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা। অথবা তাদের অন্যদেরকে অবজ্ঞা করা উচিত নয় যারা এই পার্থিব জিনিসের অধিকারী নয়, বিশ্বাস করে তাদের কোন মূল্য বা তাৎপর্য নেই, কারণ এই মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সহীহ বুখারী, 6071 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, জান্নাতী তারাই যারা সমাজের কাছে নগণ্য বলে বিবেচিত হয় এবং

এই উপসংহারে পৌঁছে যে তারা যদি শপথ গ্রহণ করে। মহান আল্লাহ তাদের জন্য তা পূরণ করবেন।

ইহকাল ও পরকালের প্রকৃত সম্মান , সফলতা ও মহানুভবতা একমাত্র তাকওয়ার মধ্যেই নিহিত। তাই মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার আদেশ পালনে যত আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবেন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকবেন এবং ধৈর্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হবেন, তারা ততই বৃহত্তর হবেন, যদিও তারা। সমাজের কাছে তুচ্ছ মনে হয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত আয়াত 13:

"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

এই পৃথিবীতে সত্যিকারের সফলতার একটি নিদর্শন, যা শুধুমাত্র তাকওয়ার মাধ্যমেই পাওয়া যায়, তা হল মানসিক ও শরীরের শান্তি। এটিই সত্যিকারের সাফল্য কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি, তাদের যা কিছু থাকুক না কেন, এটি পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু যদি কেউ ভুল জায়গায় মনের শান্তি পাওয়ার চেষ্টা করে, যেমন সম্পদ এবং খ্যাতির মাধ্যমে তা খোঁজার চেষ্টা করে, তবে তারা কেবল এটি থেকে আরও এগিয়ে যাবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

তাই একজন মুসলমানের উচিৎ এতে প্রকৃত সফলতা অন্বেষণ করা এবং পার্থিব জিনিসের সন্ধানে তাদের সময় ও প্রচেষ্টা নষ্ট করা উচিত নয়, অন্যথায় তারা আখেরাতে বড় ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 103-104:

"বলুন, আমরা কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থদের [তাদের] কর্মের ব্যাপারে অবহিত করব? [তারা] তারাই যাদের পার্থিব জীবনে পরিশ্রম নষ্ট হয়ে যায়, অথচ তারা মনে করে যে তারা ভালো কাজ করছে।"

হযরত সুলাইমান (আঃ) এর দোয়া

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে অধ্যায় 27 আন নামল, আয়াত 19 এ উল্লেখ করা হয়েছে:

"সুতরাং [সোলায়মান] হাসলেন, তার বক্তব্যে বিমোহিত হলেন এবং বললেন, "হে আমার প্রভু, আমাকে আপনার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ হতে দিন যা আপনি আমাকে এবং আমার পিতামাতার প্রতি দিয়েছেন এবং সৎকর্ম করতে যা আপনি পছন্দ করেন। এবং আমাকে তোমার রহমতে তোমার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।"

এই মহান ঘটনাটি হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের দোয়ার উল্লেখ রয়েছে। তিনি মহান আল্লাহর কাছে অনুরোধ করেন যেন তিনি তাকে সত্যিকারের কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়ার শক্তি দেন। এটি একটি সর্বোচ্চ স্তর যা একজন ব্যক্তি পৌঁছাতে পারে এবং পবিত্র কুরআন অনুসারে এটি একটি অত্যন্ত বিরল স্টেশন। অধ্যায় 34 সাবা, আয়াত 13:

"... আর আমার বান্দাদের মধ্যে খুব কমই কৃতজ্ঞ।"

মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়ার কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর ইবাদতে এত কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন

যে, তাঁর পা ফুলে গিয়েছিল। এটি সহীহ বুখারী, 6471 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

এই প্রার্থনার পরবর্তী অংশ মুসলমানদের শেখায় কিভাবে সত্যিকারের কৃতজ্ঞ হতে হয়। প্রত্যেকটি নিয়ামতকে ব্যবহার করা, যেমন একজনের জিহ্বা, এমনভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি হয়, অর্থাত্, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত দ্বারা নির্ধারিত উপায়ে। তাকে। এটা প্রমাণ করে যে, শুধু প্রশংসার শব্দ উচ্চারণই প্রকৃত কৃতজ্ঞতা নয়।

যখনই কোনো ব্যক্তি কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং আশীর্বাদ হারায়, তখন ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ থাকার জন্য তার কাছে থাকা অগণিত আশীর্বাদের কথা মনে রাখা উচিত।

মহান আল্লাহ যে ধার্মিকতাকে অনুমোদন করেন, যা এই প্রার্থনায় উল্লেখ করা হয়েছে, তা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী কাজ করাকে বোঝায়। হেদায়েতের এই দুটি উৎসের মধ্যে যে কোনো বিষয় নিহিত নয়, আল্লাহ তায়ালা তা অনুমোদন করবেন না। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

সবশেষে এই দোয়ার শেষে সাহচর্যের গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদি কেউ পরলোকগত জগতে ধার্মিকদের সঙ্গ কামনা করে , তবে তাদের অবশ্যই তাদের সঙ্গী হতে হবে এবং এই পৃথিবীতে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। এটি ধার্মিকদের প্রতি ভালবাসার প্রমাণ এবং এটি এই প্রমাণ যা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহীহ বুখারি, 3688 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করেছেন, যখন তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে লোকেরা তাদের সাথে থাকবে। পরের পৃথিবীতে প্রেম। যদি কেউ এই প্রমাণ ছাড়াই কেবল প্রেমের দাবি করে তবে তারা পরের পৃথিবীতে ধার্মিকদের সাথে শেষ হবে না। এটা সুস্পষ্ট কারণ অন্যান্য জাতিও তাদের নবী (সা.)-কে ভালোবাসে বলে দাবি করে, কিন্তু তারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় পরবর্তী পৃথিবীতে তাদের সাথে শেষ হবে না। একজন মুসলমানের অন্যথায় বিশ্বাস করে নিজেকে বোকা বানানো উচিত নয়।

সত্যিকারের আশীর্বাদ

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে অধ্যায় 27 আন নামল, 36 শ্লোকে পাওয়া যায়:

"অতএব যখন তারা সুলায়মানের কাছে এলো, তখন তিনি বললেন, "আপনি কি আমাকে সম্পদ দিয়ে থাকেন? কিন্তু আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন তা তিনি আপনাকে যা দিয়েছেন তার চেয়ে উত্তম। বরং আপনিই আপনার উপহারে আনন্দিত।"

এই সময় একজন রাণী, যাকে হযরত সুলাইমান (আঃ) ঈমান গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তার চরিত্র পরীক্ষা করার জন্য তাকে পার্থিব উপহার পাঠিয়েছিলেন। পার্থিব আশীর্বাদের জন্য তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস না করার গুরুত্ব মুসলমানদের বোঝা উচিত। এতে করে তারা যা কিছু লাভ করবে শেষ পর্যন্ত উভয় জগতে তাদের জন্য বোঝা ও অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

বরং তাদের ঈমান ও মূল্যবোধের ওপর অটল থেকে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত। যদি তারা এটি করে তবে তারা একই চিরন্তন সাফল্য লাভ করবে যা হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম প্রদান করেছিলেন। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

উপরন্তু, একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে, মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করা এবং এর সাথে সম্পর্কিত নেয়ামত সর্বদাই যে কোন পার্থিব নেয়ামতের চেয়ে বড় হবে। প্রকৃতপক্ষে, রাণীর উপহার প্রত্যাখ্যান করার সময় হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম এই কথাই উল্লেখ করেছিলেন। ধর্মীয় আশীর্বাদ সর্বদা ত্রুটিহীন এবং দীর্ঘস্থায়ী হয় যেখানে পার্থিব আশীর্বাদ সর্বদা এর সাথে কিছু ধরণের অসুবিধা যুক্ত থাকে এবং সেগুলি অস্থায়ী প্রকৃতিরও হয়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 96:

"তোমার যা আছে তা শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহর কাছে যা আছে তা চিরস্থায়ী..."

যখন কেউ মহান আল্লাহর আদেশ পালনে প্রচেষ্টা চালায়, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, তখন এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছে তা ব্যবহার করবে। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট

করার উপায়ে। ফলস্বরূপ, মহান আল্লাহ, তারপর তাদেরকে এমন কিছু দান করেন যা সমগ্র মানবজাতি, তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে, তৃপ্তি ও মানসিক শান্তির জন্য দিনরাত চেষ্টা করে। এটি সমস্ত মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য, এমনকি যদি তাদের ছোট লক্ষ্য এবং লক্ষ্য থাকে, যেমন বিশ্ব ভ্রমণ। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 2373 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, প্রকৃত ঐশ্বর্য সম্পদের সাথে নিহিত নয় বরং জীবনে সন্তুষ্ট থাকা। এই কারণেই দুনিয়াবী ধনী ব্যক্তিরা প্রকৃত মানসিক শান্তি পায় না এবং কেন একজন দরিদ্র মুসলিম যারা মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করে, তারা তা করে। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর শান্তি পায়।"

অত্যধিকতা পরিহার করে হালাল সম্পদ অন্বেষণে কোন দোষ নেই তবে মুসলমানদের বোঝা উচিত যে মহান আল্লাহ ধন-সম্পদ বা অন্যান্য পার্থিব জিনিস দিয়ে মনের শান্তি স্থাপন করেননি।

হযরত ইউনুস (সঃ) ও তিমি

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে অধ্যায় 37 Saffat, 142 আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে:

"তারপর মাছ তাকে গিলে ফেলল..."

এই ঘটনাটি হযরত ইউনুস (আঃ) সম্পর্কে আলোচনা করে, যখন তিনি মহান আল্লাহর কাছ থেকে পূর্বানুমতি ছাড়াই তাঁর সম্প্রদায় ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে একটি তিমি গিলে ফেলেছিলেন। বাস্তবে, অনেক মুসলমান হযরত ইউনূস (আঃ)-এর অনুরূপ অবস্থার মধ্যে রয়েছে, কারণ তারা তাদের এই জড় জগতের আকাঙ্ক্ষা এবং ভালবাসার দ্বারা গ্রাস এবং আটকা পড়েছে, যা তাদের আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করেছে এবং কেবল নেতৃত্ব দিচ্ছে। অনেক মানসিক ব্যাধি, যেমন বিষণ্নতা। তাদের থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হল সবকিছুকে তার সঠিক জায়গায় স্থাপন করা। বস্তুগত জগতকে পরিত্যাগ করার প্রয়োজন নেই, বরং মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে নির্ধারিত অগ্রাধিকারের ক্রম অনুসারে জিনিসগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে । মুসলিমরা শুধুমাত্র জাগতিক জিনিসের দ্বারা আটকা পড়ে এবং বিভ্রান্ত হয় কারণ তারা এই অগ্রাধিকারের ক্রমটি পুনর্বিন্যাস করে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু বাবা-মা তাদের সন্তানদের লালন-পালন করার জন্য তাদের সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করে, এমনকি যদি এর অর্থ তারা অবৈধ ব্যবহার করে। যখন কেউ এইভাবে কাজ করে তখন এই সম্পর্ক তাদের ফাঁদে ফেলে এবং মহান আল্লাহর রহমত পেতে বাধা দেয়। এটা তখনও ঘটবে যদি তারা তাদের ফরজ নামাজ আদায় করে, কারণ ইসলাম এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য দিনের বেলায় শুধু এক বা দুই ঘণ্টা নয়, জীবনের

সব ক্ষেত্রেই প্রসারিত। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা এর সাথে জড়িত। কেউ কেবল তখনই এই ধরণের চরম আচরণ এড়াতে পারে যখন তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যগুলি শিখে এবং আমল করে, কারণ এই ঐশ্বরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল মুসলমানদেরকে তাদের সংগঠিত এবং অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য গাইড করা। পার্থিব এবং ধর্মীয় জীবন সঠিকভাবে যাতে তারা উভয়ের থেকে সর্বাধিক উপকার লাভ করে, সন্তুষ্ট এবং সন্তুষ্ট থাকে। যারা এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে দেখতে পাবে যে তারা একের পর এক কামনার পেটে আটকে থাকবে যতক্ষণ না তারা তাদের জীবন নিয়ে অসন্তুষ্ট এবং অসন্তুষ্ট হয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

মহানবী জাকারিয়া (সাঃ) এর দোয়া

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে অধ্যায় 19 মরিয়ম, 4-6 আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

"সে বলল, "হে আমার প্রভু, আমার হাড়গুলো দুর্বল হয়ে গেছে, এবং আমার মাথা সাদা হয়ে গেছে, এবং আমি কখনই আপনার কাছে প্রার্থনা করিনি, হে আমার পালনকর্তা, অসুখী [অর্থাৎ হতাশ]। এবং অবশ্যই আমি উত্তরাধিকারীদের ভয় করি। আমার পরে, এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, তাই আমাকে আপনার কাছ থেকে উত্তরাধিকারী হবে এবং ইয়াকুবের বংশ থেকে উত্তরাধিকারী হবে এবং তাকে খুশি করুন।"

মহানবী জাকারিয়া (আঃ)-এর এই দোয়াটি মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করার কিছু আদব শিক্ষা দেয়। একজন মুসলমানের উচিত তাদের সহজাত দুর্বলতাকে চিনতে হবে এবং কাজ ও কথার মাধ্যমে তা প্রদর্শন করা উচিত, যেমনটি হযরত জাকারিয়া (সা.) করেছিলেন। এটি নম্রতার একটি দিক যা দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।

উপরন্তু, একজনকে কৃতজ্ঞতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকটি পূরণ করা উচিত যা হল তাদের প্রার্থনার সময় মহান আল্লাহর নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা, যা কৃতজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত হলে আশীর্বাদ বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে। কর্মে কৃতজ্ঞতা দেখানোর সাথে জড়িত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

যদিও, হালাল পার্থিব জিনিস চাওয়ার মধ্যে কোন দোষ নেই, তবুও একজন মুসলমানকে বিশ্বাস করার জন্য প্রতারিত করা উচিত নয় যে এটি মহানবী যাকারিয়া (সাঃ) করেছিলেন। তিনি পার্থিব কারণে একটি সন্তানের জন্য প্রার্থনা করেননি, যা অধিকাংশ মুসলমান করে। তিনি পরিবর্তে একজন মহানবী (সা.)-এর জন্য অনুরোধ করেছিলেন, যিনি মহান আল্লাহর বাণী প্রচারে তার মিশন চালিয়ে যাবেন। অতএব, তিনি কোন পার্থিব জিনিসের জন্য অনুরোধ করেননি বরং মহান আল্লাহর কাছে একটি ধর্মীয় অনুগ্রহ চেয়েছিলেন। এই প্রার্থনায় যে উত্তরাধিকারের কথা বলা হয়েছে তা এই ধর্মীয় উদ্দেশ্যকে বোঝায়, পার্থিব জিনিসের প্রতি নয়, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরাধিকার হিসাবে সম্পদ রেখে যান না, বরং তারা কেবল জ্ঞান রেখে যান। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 223 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

এই মহান ঘটনাটি মুসলমানদের তাদের উদ্দেশ্যের অর্থ সংশোধন করতেও শেখায়, তারা যে জিনিসগুলি কামনা করে তা পরকালের সাথে সংযুক্ত হওয়া উচিত এবং কেবল বস্তুগত জগতের সাথে নয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন বিবাহিত দম্পতিকে পৃথিবীতে মহান আল্লাহর আনুগত্যকারী বান্দাদের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সন্তান কামনা করা উচিত, পার্থিব কারণে নয়। এটি তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ তাদের সন্তানদেরকে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী বড় করে তোলে। কিন্তু এটা তখনই সম্ভব যখন একজন অভিভাবক নিজে ইসলামিক জ্ঞান শিখে এবং তার উপর কাজ করে। একজন মুসলিম যে ধর্মীয় বিষয়গুলি কামনা করে, সে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তা করে। আর

যদি মহান আল্লাহ তাদেরকে সেই জিনিসটি না দিতে চান তবে তাদের উচিত ধৈর্য সহকারে তাঁর পছন্দ গ্রহণ করা, কারণ এটিই মহান আল্লাহকে খুশি করে।

হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) এর গুণাবলী

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে অধ্যায় 19 মরিয়ম, 12-14 আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

"[আল্লাহ বললেন], "হে জন, দৃঢ় সংকল্পের সাথে কিতাব গ্রহণ কর [অর্থাৎ তা মেনে চল]।" এবং আমি তাকে বালক অবস্থায় ফয়সালা দিয়েছিলাম। এবং আমাদের পক্ষ থেকে স্নেহ ও পবিত্রতা এবং তিনি আল্লাহকে ভয় করতেন। এবং তার পিতামাতার প্রতি কর্তব্যপরায়ণ, এবং তিনি অবাধ্য অত্যাচারী ছিলেন না।"

হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম-এর কিছু গুণাবলী আলোচনা করা হল, যেগুলো গ্রহণ করার জন্য মুসলমানদের সচেষ্ট থাকতে হবে। মুসলমানদের জন্য দরকারী জ্ঞান অর্জন করা এবং তার উপর কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি সত্য প্রজ্ঞা এবং সূক্ষ্ম বিচার। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তাদের জ্ঞান ব্যবহার করেন যাতে এটি তাদের এবং উভয় জগতের অন্যদের উপকার করে। জ্ঞান নিজেই এই ফলাফল অর্জন করে না। এই কারণেই প্রচুর লোক রয়েছে যারা প্রচুর পার্থিব ও ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী তবুও তারা তাদের জ্ঞানকে সঠিকভাবে প্রয়োগ না করার কারণে বিভ্রান্তিতে হারিয়ে গেছে। এটি অর্জনের সর্বোত্তম উপায় হ'ল জ্ঞান অর্জন করা এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে তা প্রয়োগ করা, কারণ তাঁর মতো জ্ঞান কাউকে দেওয়া হয়নি। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 2:

"তিনিই নিরক্ষর [আরবদের] মধ্যে তাদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং তাদের পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব [অর্থাৎ, কুরআন] এবং প্রজ্ঞা [অর্থাৎ, সুন্নাহ] শিক্ষা দেন - যদিও তারা আগে ছিল। পরিষ্কার ত্রুটি।"

মুসলমানদের উচিত তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে শুদ্ধ করার চেষ্টা করা, কারণ এটি তাদের দেহের পরিশুদ্ধির দিকে পরিচালিত করবে। এটি সহীহ মুসলিম, 4094 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি অর্জনের সর্বোত্তম উপায় হল পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখা এবং আমল করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভাল দিয়ে প্রতিস্থাপন করবে। এর ফলে হৃৎপিণ্ড ও শরীর পরিশুদ্ধ হয়।

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ভয় করে, সে তার হুকুম পালনে সচেষ্ট হবে, তার নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকবে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হবে।

পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং কর্তব্যপরায়ণ হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ইচ্ছা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, ততক্ষণ একজন মুসলমানের উচিত সেগুলি পূরণ করার জন্য এবং তাদের প্রতি করুণাময় হতে চেষ্টা করা, যেমনটি তারা শৈশবকালে তাদের সন্তানের প্রতি করুণাময় ছিল। একটি শিশুকে তাদের পিতামাতার সাথে অসম্মতি জানানোর অনুমতি দেওয়া হয় তবে সর্বদা সম্মান বজায় রাখতে হবে। সোজা কথায়, যদি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মুসলমান না হয়েও তাদের পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার নির্দেশ দেন, তবে কেউ কি ধারণা করতে পারে যে মুসলিম পিতামাতার কতটা

সম্মানের যোগ্য? সহীহ বুখারী, 5979 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি অত্যাচারীর মতো আচরণ করা উচিত নয়। না অন্যদের প্রতি অন্যায় করে বা নিজের কাছে যে আশীর্বাদ আছে তা ভুল উপায়ে ব্যবহার করে। যদি তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে ব্যর্থ হয়, অত্যাচার শুধুমাত্র একটি মহান দিনে একটি কঠিন শাস্তির দিকে পরিচালিত করবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 111:

"...এবং সে ব্যর্থ হবে যে অন্যায় বহন করে।"

ঐশ্বরিক উদঘাটন

পরবর্তী যে মহান ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা করা হবে তা হল পবিত্র কোরআন শরীফের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অবতীর্ণ ঐশী ওহী। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 32:

"আর যারা কাফের তারা বলে, "কেন তার প্রতি একবারে কুরআন অবতীর্ণ হল না?" এমনিভাবে আমরা এর দ্বারা তোমার হৃদয়কে শক্তিশালী করতে পারি। এবং আমরা এটি সুস্পষ্টভাবে ব্যবধান করেছি।"

এই আয়াত দ্বারা নির্দেশিত, পবিত্র কুরআন পর্যায়ক্রমে নাজিল হয়েছিল। এটি ইঙ্গিত দেয় যে মুসলমানদের অবশ্যই সময়ের সাথে সাথে ধাপে ধাপে এবং নিয়মিতভাবে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি করতে হবে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা এর অন্তর্ভুক্ত। তারা রাতারাতি সাধু হয়ে যাবে বলে আশা করা যায় না। এটি তাদের স্বাচ্ছন্দ্যে ইসলামিক জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করতে এবং সারাদিনে তাদের অন্যান্য দায়িত্ব পালন করতে দেয়।

উপরন্তু, মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের তিনটি দিকই পূরণ করতে হবে যদি তারা এর দ্বারা সঠিকভাবে পরিচালিত হতে চায়। প্রথমটি হল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সঠিকভাবে এবং নিয়মিত পাঠ করা। পরবর্তী দিকটি হল একটি নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে অধ্যয়ন করে এর অর্থ বোঝা এবং

চূড়ান্ত পর্যায় হল পবিত্র কুরআনের শিক্ষার উপর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী আমল করা। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান সর্বনিম্ন স্তরে থাকতে সন্তুষ্ট এবং কেবল তা পাঠ করে। এটি পবিত্র কুরআনের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করে, কারণ এটি একটি হেদায়েতের বই, তেলাওয়াতের বই নয়। কেউ কেবল মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি করতে পারে, তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এবং অধ্যয়ন ও আমলের মাধ্যমে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে। শুধুমাত্র এটি পাঠ করলে এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করা যাবে না, বিশেষ করে যখন অধিকাংশ মুসলমান আরবি ভাষা বোঝে না।

পরিশেষে, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, পবিত্র কুরআন পার্থিব সমস্যার নিরাময় হলেও একজন মুসলমানের শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা উচিত নয়। অর্থ, তাদের কেবল তাদের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্যই তা তিলাওয়াত করা উচিত নয়, পবিত্র কুরআনকে এমন একটি হাতিয়ারের মতো আচরণ করা উচিত যা অসুবিধার সময় সরিয়ে ফেলা হয় এবং তারপরে একটি টুলবক্সে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনের প্রধান কাজ হল একজনকে নিরাপদে পরকালের দিকে পরিচালিত করা। এই মূল কাজটিকে অবহেলা করা এবং শুধুমাত্র নিজের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য এটি ব্যবহার করা সঠিক নয়, কারণ এটি একজন প্রকৃত মুসলমানের আচরণের সাথে সাংঘর্ষিক। এটি এমন একজনের মতো যে অনেকগুলি আনুষাঙ্গিক সহ একটি গাড়ি কেনে তবে এটির কোনও ইঞ্জিন নেই৷ কোন সন্দেহ নেই যে এই ব্যক্তিটি কেবল বোকা।

স্বর্গীয় যাত্রা

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে তা হল পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্বর্গীয় যাত্রা, যা আল ইসরা 17 অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে:

"পবিত্র তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে (অর্থাৎ, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) রাতের বেলায় নিয়ে গেছেন আল-মসজিদ আল- হারাম থেকে আল-মসজিদ আল- আকসা পর্যন্ত, যার চারপাশে আমরা বরকত দান করেছি, তাকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য। ..."

ইসলামের শিক্ষার মধ্যে এটি ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং এটি থেকে অনেক শিক্ষা নেওয়া যেতে পারে। সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল যে, মুসলমানদের তাদের সমস্যা সমাধান এবং সমস্যা থেকে মুক্তির পথ প্রদানের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ করা উচিত নয়। এই স্বর্গীয় যাত্রা অসম্ভব শোনায়, তবুও এটি ঘটেছে কারণ কিছুই মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার বাইরে নয়। সমস্ত অসুবিধা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শর্ত হল মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। তাকে। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 2:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন"

পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি লক্ষণীয় যে, এই মহান ঘটনাটি এবং শুরুতে উদ্ধৃত আয়াতটি নির্দেশ করে যে একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ পদে পৌঁছাতে পারে, অর্থাৎ মহান আল্লাহর একজন আন্তরিক বান্দা। এর চেয়ে বড় মর্যাদা থাকলে মহান আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উল্লেখ করতেন। এটি অনেক হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেমন সহীহ মুসলিম, 851 নম্বরে পাওয়া একটি, যেখানে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রসূল ঘোষণা করার আগে নিজেকে মহান আল্লাহর বান্দা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এটি সমস্ত মুসলমানদের জন্য একটি সুস্পষ্ট শিক্ষা যে তারা যদি চূড়ান্ত সাফল্য এবং উভয় জগতে সর্বোচ্চ পদ কামনা করে তবে তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর প্রকৃত বান্দা হতে হবে। আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা, অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই এটি অর্জিত হয়। দাসত্ব অন্য কোন উপায়ে অর্জন করা সম্ভব নয়। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

জামে আত তিরমিযীতে পাওয়া একটি হাদিস, 213 নম্বর, বেহেশতী যাত্রার একটি নির্দিষ্ট অংশ আলোচনা করে। এটি যখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ উপহার দেওয়া হয়েছিল। এই সত্যটি যে একমাত্র ফরয কর্তব্য ছিল যেটি এইভাবে দেওয়া হয়েছিল যখন বাকিগুলি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে প্রকাশিত হয়েছিল, তিনি পৃথিবীতে থাকাকালীন, ফরয সালাত প্রতিষ্ঠার গুরুত্বকে দেখায়। এই সুনির্দিষ্ট হাদিসটি পরামর্শ দেয় যে

প্রাথমিকভাবে পঞ্চাশটি ফরজ নামাজের আদেশ দেওয়া হয়েছিল এবং পাঁচটি অবশিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ধীরে ধীরে তা হ্রাস করা হয়েছিল। যদি একজন মুসলমানকে প্রতিদিন পঞ্চাশটি ফরজ নামাজ পড়তে হয় তবে তা তাদের অন্য কিছু করতে বাধা দেবে। এতে ফরজ নামাজের গুরুত্ব বোঝা যায়। এটি মুসলমানদের শেখায় যে বাধ্যতামূলক নামাজ অবশ্যই তাদের জীবনের কেন্দ্র হতে হবে। একজনের উচিত তাদের জীবনকে তাদের ফরজ নামাজের চারপাশে ঢালাই করা এবং তাদের কর্তব্যকে তাদের জীবনের চারপাশে ঢালাই না।

উপরন্তু, বাধ্যতামূলক নামাযগুলি বস্তুগত জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় কীভাবে একজন মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত হওয়া উচিত তার একটি ইঙ্গিত। নামাজরত একজন মুসলমানের নামাজের সময় কথা বলা, খাওয়া বা অন্যান্য স্বাভাবিক হালাল কাজ করার অনুমতি নেই। এটি তার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপনের গুরুত্ব নির্দেশ করে। প্রাথমিকভাবে দৈনিক পঞ্চাশটি ফরজ নামাজ পূর্ণ করার আদেশ দেওয়া মুসলমানদের মনে করিয়ে দেয় যে মহান আল্লাহর সাথে এই আনুগত্য এবং সংযোগ তাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হওয়া উচিত এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্যান্য সমস্ত জিনিস তাদের যথাযথ স্থানে স্থাপন করা উচিত। এটাই মানবজাতির প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাদের উদ্দেশ্য এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় এবং নিরর্থক জিনিসগুলির জন্য প্রচেষ্টা করা নয়। এই জড় জগত একটি সেতু যা একজনকে পরকালের সাথে সংযুক্ত করে। এটা স্থায়ী বাড়ি নয়। ফরজ নামাজ এবং এই মহান ঘটনা মুসলমানদের এই সত্যটি স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই তাদের উচিত ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী এই সেতু পার হওয়ার জন্য চেষ্টা করা যাতে তারা নিরাপদে পরকালে পৌঁছাতে পারে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা এর সাথে জড়িত। এটি নিশ্চিত করবে যে একজনের এই পৃথিবীতে একটি শান্তিপূর্ণ যাত্রা এবং পরবর্তীতে একটি শান্তিপূর্ণ স্থায়ী বাড়ি রয়েছে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

মাইগ্রেশন

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে তা হল মক্কা নগরী থেকে মদীনা শহরে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণের হিজরত। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 40:

“যদি আপনি তাকে [অর্থাৎ, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে] সাহায্য না করেন - আল্লাহ ইতিমধ্যেই তাকে সাহায্য করেছেন যখন কাফেররা তাকে [মক্কা থেকে] দু'জনের একজন হিসাবে বের করে দিয়েছে, যখন তারা গুহায় ছিল। এবং তিনি [অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] তার সঙ্গীকে বললেন, "দুঃখ করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" এবং আল্লাহ তার উপর তার প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাকে সৈন্যদের সাহায্য করলেন [অর্থাৎ, ফেরেশতাদের] যাদের আপনি দেখেননি..."

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এমন অসুবিধাগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য মহান আল্লাহ মুসলমানদের কাছে দাবি করেন না। উদাহরণ স্বরূপ, এই আয়াতে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার কথা বলা হয়েছে যেখানে তারা তাদের পরিবার, বাড়িঘর, ব্যবসা-বাণিজ্য রেখে এক বিচিত্র দেশে হিজরত করেছিল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

তুলনামূলকভাবে, মুসলমানরা এখন যে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন তা ততটা কঠিন নয় যতটা ধার্মিক পূর্বসূরিরা সম্মুখীন হয়েছিল। তাই মুসলমানদের কৃতজ্ঞ

হওয়া উচিত যে তাদের শুধুমাত্র কয়েকটি ছোট কুরবানী করতে হবে, যেমন ফরজ ফজরের নামাজ পড়ার জন্য কিছু ঘুম কুরবানী এবং বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করার জন্য কিছু সম্পদ। মহান আল্লাহ তাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য তাদের বাড়িঘর ও পরিবার পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিচ্ছেন না। এই কৃতজ্ঞতা অবশ্যই ব্যবহারিকভাবে দেখাতে হবে যে আশীর্বাদগুলো একজনের কাছে রয়েছে এমন উপায়ে ব্যবহার করে যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে।

উপরন্তু, যখন একজন মুসলিম সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তাদের উচিত ধার্মিক পূর্বসূরিরা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল এবং কীভাবে তারা মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের কাটিয়ে উঠেছিল তা স্মরণ করা উচিত, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশগুলি পূরণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর। এই অনুস্মারকটি একজন মুসলিমকে তাদের অসুবিধাগুলি কাটিয়ে উঠতে শক্তি প্রদান করতে পারে, কারণ তারা জানে যে ধার্মিক পূর্বসূরিরা মহান আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় ছিল, তবুও তারা ধৈর্যের সাথে আরও কঠিন সমস্যা সহ্য করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে ইবনে মাজাহ, 4023 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহানবী (সাঃ) তাদের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা সহ্য করেছেন এবং তারা নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

একজন মুসলমান যদি ধার্মিক পূর্বসূরিদের অটল মনোভাব অনুসরণ করে তবে আশা করা যায় যে তারা পরকালে তাদের সাথেই থাকবে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 69:

"এবং যারা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করে- তারা তাদের সাথে থাকবে যাদের উপর আল্লাহ নবীদের অনুগ্রহ করেছেন, সত্যের অবিচল, শহীদ এবং সৎকর্মশীল। এবং তারা উত্তম সঙ্গী হিসাবে।"

ট্রেঞ্চ

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে তা হল ট্রেঞ্চের যুদ্ধ। এটি একটি বিখ্যাত যুদ্ধ যা সংঘটিত হয়েছিল যখন অমুসলিমরা ইসলামের আলো নিভানোর জন্য মদিনা শহরকে ঘিরে ফেলে। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 22:

"এবং যখন মুমিনরা দলগুলোকে দেখল, তখন তারা বলল, "আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদের সাথে এটাই ওয়াদা করেছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল সত্য বলেছেন।" এবং এটি তাদের কেবল বিশ্বাস ও গ্রহণযোগ্যতায় বৃদ্ধি করেছে।"

শেখার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল যে, সাহাবায়ে কেরামের মতো, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, তাদের পরবর্তী মুসলমানরাও অসুবিধার সম্মুখীন হবেন। এই অসুবিধাগুলি মহান আল্লাহর প্রকৃত বান্দাদেরকে তাদের থেকে বিভক্ত করে যারা তাঁর আনুগত্যে সংগ্রাম করে না, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। তার উপর হতে সুতরাং এই পৃথিবীতে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া কখনই একজন মুসলমানকে অবাক করা উচিত নয়, কারণ এটি এই বিশ্বের আদর্শ। এটা আসলে এই পৃথিবীর উদ্দেশ্য। অধ্যায় 67 আল মুলক, আয়াত 2:

"[তিনি] যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম..."

একজন মুসলমানের দায়িত্ব এই নিশ্চিত অসুবিধাগুলির উপর চাপ দেওয়া নয় বরং সাহাবায়ে কেরামের মতো আচরণ করা, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, যথা, মহান, পূর্ণ জ্ঞানী আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকা। যে একই ভাবে অসুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে, তাই চূড়ান্ত বিজয় আছে. এই বিজয়ের একমাত্র শর্ত মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকা। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 2:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

প্রকৃতপক্ষে, একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে অবিচলিতদের জন্য চূড়ান্ত বিজয় নিশ্চিত করা হয়েছে, একইভাবে ভাল বা খারাপ প্রতিটি পরিস্থিতিতে আশীর্বাদ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে, কঠিন সময়ে ধৈর্যশীল থাকা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে কৃতজ্ঞ থাকা, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে একজনের কাছে থাকা নেয়ামতগুলো ব্যবহার করে। এটি সহীহ মুসলিম, 7500 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

এই গ্যারান্টিগুলি মনে রাখা একজনকে কেবল অসুবিধার জন্য প্রত্যাশা করতে এবং মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে সহায়তা করে না বরং এটি তাকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় রাখে, পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় বিষয়েই সাফল্যের বিষয়টি জানার মধ্যেই রয়েছে।

(সাঃ) এর জীবনী

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে তা হল পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ইন্তেকাল, অধ্যায় 3 আলে, 144 নং আয়াতে নির্দেশিত:

"মুহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া নন। [অন্যান্য] রসূল তার পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। সুতরাং যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন, তবে আপনি কি ফিরে যাবেন [অবিশ্বাসের দিকে]? আর যে তার গোড়ালিতে ফিরে যায় সে কখনো আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না..."

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজাতিকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে পরিচালিত করার জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। মুসলমানদের জন্য তাঁর সাহাবীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যারা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শিক্ষার উপর অবিচল ছিলেন। সমস্ত মুসলমান পরকালে তাঁর সঙ্গ কামনা করে কিন্তু তারা কেবল তখনই তা পাবে যদি তারা কার্যত তাঁর পথ অনুসরণ করে। একজন ব্যক্তি তার বন্ধুর সাথে মিলিত হবে না যে একটি নির্দিষ্ট পথ ধরে যাত্রা করেছে যদি তারা একই পথে যাত্রা না করে। একইভাবে, মুসলমানরা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে শেষ হবে না, যদি তারা তাঁর পরিবর্তে অন্য পথে চলে। এটি শুধুমাত্র পবিত্র কুরআন ও তার ঐতিহ্যের উপর শিক্ষা গ্রহণ ও আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

উপরন্তু, সাধারণভাবে বলতে গেলে, লোকেরা যখন পার্থিব জিনিস, যেমন অন্যদের কাছ থেকে সম্পদের উত্তরাধিকারী হয় তখন খুশি হয়। কিন্তু মহানবী

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরাধিকার সূত্রে মানুষের জন্য সম্পদ রেখে যাননি। তিনিও অন্যান্য নবী (সাঃ) এর মত জ্ঞান রেখে গেছেন। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 223 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই, মুসলমানদের অবশ্যই এই উত্তরাধিকারের একটি অংশ নিতে হবে যদি তারা তার প্রকৃত উত্তরাধিকারী হতে চায়।

পরিশেষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন, কিভাবে একজন মুসলিমকে আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করতে হবে তার নিখুঁত উদাহরণ। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা, যেমনটি কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই তার জীবন অধ্যয়ন করতে হবে এবং তাদের কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করার জন্য তার শিক্ষার উপর আমল করতে হবে। এটা ছাড়া সফলতা সম্ভব নয়। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 21:

"অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম নমুনা তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে এবং [যে] বারবার আল্লাহকে স্মরণ করে।"

আবু বকর সিদ্দিক (রা.) নির্বাচন করা

পরবর্তী যে মহান ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা করা হবে তা সহীহ বুখারী, ৩৬৬৭ ও ৩৬৬৮ নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। তখন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) কে নির্বাচিত করার সিদ্ধান্ত নেন। ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে।

এই মহান ঘটনা থেকে শেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ হল ভাল বিষয়ে অন্যদের সমর্থন করার গুরুত্ব। এটি এবং অন্যান্য হাদিস থেকে এটা স্পষ্ট যে, আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু জনগণকে তাদের খলিফা হিসেবে অন্য কাউকে বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি এমনকি উমর বিন খাতাব নাম রেখেছিলেন, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট। উমর বিন খাতাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর জন্য এটি ছিল কোনো যুক্তি বা সমস্যা ছাড়াই মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রথম প্রতিনিধি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার উপযুক্ত সুযোগ। তবে তিনি সঠিক কাজটি করতে বেছে নিয়েছিলেন এবং ভূমিকার জন্য সেরা ব্যক্তিকে নিয়োগ করে মুসলিম জাতিকে সাহায্য করেছিলেন। তিনি চিন্তা করেননি যে তিনি যদি অন্য কাউকে সমর্থন করেন তবে তার পদমর্যাদা এবং সামাজিক মর্যাদা হ্রাস পাবে বা তাকে ভুলে যাবে। প্রকৃতপক্ষে, এই সঠিক পছন্দের পরেই তার সম্মান এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম এমনকি ইসলামী প্রতিষ্ঠানও এইভাবে আচরণ করে না। যারা ভালো কিছু করে তাকে সাহায্য করার পরিবর্তে তারা প্রায়শই শুধুমাত্র যাদের সাথে তাদের সম্পর্ক রয়েছে তাদের সমর্থন করে। তারা এমন আচরণ করে যেন অন্যদের ভালো কাজে সহযোগিতা করলে তাদের সামাজিক মর্যাদা কমে যায়। কেউ কেউ আরও নীচে নেমে গেছে এবং তাদের বন্ধু এবং

আত্মীয়দের খারাপ কাজে সমর্থন করে এবং অপরিচিতদের যারা ভাল করছে তাদের সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে ইসলামী সম্প্রদায় দুর্বল হওয়ার এটি একটি বড় কারণ। সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, সংখ্যায় কম ছিলেন কিন্তু অন্য কিছুর চিন্তা না করে সর্বদা কল্যাণের বিষয়ে একে অপরকে সমর্থন করে তাদের দায়িত্ব পালন করতেন। মুসলমানদের অবশ্যই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে যদি তারা উভয় জগতে শক্তি ও সম্মান চায়। কে করছে তার পরিবর্তে অন্যরা কী করছে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যদি তারা ভাল কাজ করে তবে তাদের তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করা উচিত কিন্তু তারা যদি খারাপ কিছু করে তবে তাদের উচিত তাদের বিরুদ্ধে সতর্ক করা এবং এতে যোগ দিতে অস্বীকার করা। আল্লাহর অবাধ্যতা হলে মানুষের প্রতি আনুগত্য বা আনুগত্য নেই। উচ্চাভিলাষী। প্রকৃতপক্ষে, অন্যের প্রতি আনুগত্য কেবলমাত্র মহান আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যেই নিহিত হতে হবে, তারা যে কার সাথেই আচরণ করুক না কেন। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

অটল খলিফা - আবু বকর সিদ্দিক (রা.)

পরবর্তী যে মহান ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা করা হবে তা সহীহ বুখারীর ৭২৮৪ ও ৭২৮৫ নং হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি সেই সময় যখন ইসলামের প্রথম সঠিক পথপ্রদর্শক খলিফা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর শিক্ষার উপর অটল ছিলেন। ইসলাম যদিও অনেক মুসলমান মিথ্যা নবীদের অনুসরণ করে কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করেছিল এবং অন্যরা বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করতে অস্বীকার করেছিল, যা সহীহ মুসলিমের 111 নম্বর হাদিস অনুসারে ঈমানের স্তম্ভ।

এই অবিচল মনোভাব ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক মুসলমানদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। মুসলিমদের পার্থিব বিষয়ের জন্য কোনো দায়িত্বের সাথে আপস করা উচিত নয় কারণ এই জিনিসগুলি শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য চাপ এবং বোঝা হয়ে দাঁড়াবে, যদি তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হয় তবে পরবর্তী পৃথিবীতে তাদের জন্য যে শাস্তি অপেক্ষা করছে তা ছেড়ে দেওয়া উচিত। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

একজন মুসলমানকে এই বিশ্বাসে প্রতারিত করা উচিত নয় যে তারা যদি তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তবে তারা মহান আল্লাহর বিচার ও শাস্তি

থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাবে। শুধু নিজের অবাধ্যতা এবং বিচার দিবসের বাস্তবতাকে উপেক্ষা করলে তা দূর হবে না। যখন কেউ ইসলামকে তাদের বিশ্বাস হিসাবে গ্রহণ করে এবং একজন মুসলিম হয়, তখন এর মধ্যে ইসলামের সাথে থাকা দায়িত্ব পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করা অন্তর্ভুক্ত ছিল। একজন ব্যক্তি যে একটি চাকরি গ্রহণ করে, সংজ্ঞা অনুসারে তার সাথে আসা কর্তব্যগুলি গ্রহণ করে। যদি তারা কেবল তাদের দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকার করে তবে নিঃসন্দেহে তাদের বরখাস্ত করা হবে। একইভাবে, যে ব্যক্তি ইসলামকে তাদের দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করার পরে তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে অস্বীকার করে সে নিজেকে উভয় জগতে শাস্তি ও অসুবিধা দ্বারা পরিবেষ্টিত দেখতে পাবে।

বাস্তবে, বাধ্যতামূলক দায়িত্বগুলি অনেক নয় এবং এত সময় বা প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি কাউকে তার সামর্থ্যের চেয়ে বেশি বোঝা দেন না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

সুতরাং একজন ব্যক্তির উপর ফরয যে কোন দায়িত্ব তাদের দ্বারা পালন করা যেতে পারে। এটি শুধুমাত্র তাদের চরম অলসতা এবং দুর্বল সিদ্ধান্ত যা তাদের এটি করতে বাধা দেয়। তাই মুসলমানদের অবশ্যই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে, তারা একটি মহান দিনে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার আগে।

খলিফার আত্মত্যাগ - উসমান বিন আফফান (রা.)

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে তা হল ইসলামের তৃতীয় সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা উসমান বিন আফফানের ধৈর্য ও আত্মত্যাগ।

এই মহান ঘটনাটি মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিচিত। কিন্তু সারসংক্ষেপে বলা যায়, উসমান বিন আফফান, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, ধৈর্য ধরেছিলেন এবং যারা অন্যায়ভাবে তাঁর অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন তাদের রক্তপাত এড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সহজেই তাদের প্রতিরোধকে চূর্ণ করতে পারতেন কিন্তু ধৈর্য ধরে থাকতে বেছে নিয়েছিলেন কারণ তিনি তাদের ক্ষতি করতে চাননি এবং মুসলিম জাতির মধ্যে বিদ্রোহের আগুন আরও ছড়িয়ে দিয়েছেন। এই ধৈর্য ও আত্মত্যাগই তাকে শাহাদাত বরণ করে। এই ঘটনাটি অনেক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন জামি আত তিরমিযী, 3803 নম্বরে পাওয়া একটি ঘটনা।

ইসলাম মুসলমানদেরকে এই ধরনের কুরবানী করার জন্য দাবি করে না তবে এটি তাদের ছোট করার পরামর্শ দেয়, যেমন কেউ তাদের বাধ্যতামূলক দান করার পরে স্বেচ্ছায় দান করা বা স্বেচ্ছায় রাতের নামাজ পড়ার জন্য কিছু ঘুম কুরবানী করা। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে যখন কেউ এইসব ত্যাগ স্বীকার করে তা ইহকাল ও পরকালে তার উপকার করে। এমনকি যদি মনে হয় যে তারা হারাচ্ছে এবং অন্যরা উপকৃত হচ্ছে, যেমন দান করা। মহান আল্লাহ সর্বদা এমন একজন মুসলিমকে আশীর্বাদ করবেন যে তার জন্য কুরবানী করে যা তাদের কুরবানীর চেয়ে অনেক বেশি। এটা অনেক আয়াত, হাদীস ও ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত, যেমন এর একটি। যে মুসলমান এই কুরবানী করতে অস্বীকার করবে সে কখনই এই বিশেষ আশীর্বাদ লাভ করবে না এবং তারা উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছতে পারবে না। যদি কেউ ত্যাগ ব্যতীত অস্থায়ী পার্থিব জিনিস না পায়,

তবে ত্যাগ ব্যতীত তারা কীভাবে শাশ্বত ধর্মীয় আশীর্বাদ পাওয়ার আশা করতে পারে? একজন মুসলমানের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে তারা কেবলমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করার মাধ্যমে আরও বড় আশীর্বাদ লাভ করবে এবং ধার্মিক পূর্বসূরিদের স্মরণ করবে যারা একই কাজ করেছিল যাতে তারাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। সহজ কথায়, যত বেশি কুরবানী করবে, তত বেশি পাবে এবং যত কম কোরবানি করবে, তত কম পাবে। সুতরাং এটা প্রত্যেক মুসলমানের উপর নির্ভর করে যে তারা বেশি আশীর্বাদ চায় বা কম চায়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

বিদ্রেহীরা

পরবর্তী যে মহান ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা করা হবে তা অনেক হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন সহীহ বুখারীতে পাওয়া একটি, নং 6934। এটি সেই সময় যখন বিদ্রোহীরা ইসলামের চতুর্থ সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা আলী ইবনে আবু তালিবের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। এই হাদিসটি, অন্য অনেকের মতোই ইঙ্গিত করে যে, বিদ্রোহীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর একনিষ্ঠ উপাসক ছিল, কিন্তু যে জিনিসটি তাদের ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে বিচ্যুত করেছিল তা ছিল তাদের অজ্ঞতা। তারা মূর্খতার সাথে ইবাদতকে ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও আমলের চেয়ে বেশি মূল্য দিয়েছে। তাদের অজ্ঞতার কারণে তারা ইসলামের শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করেছে যা তাদের জঘন্য পাপের দিকে নিয়ে গেছে। তারা যদি প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হতো, তাহলে এমনটা হতো না।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে কিভাবে জ্ঞান পাপ প্রতিরোধ করতে পারে, বিশেষ করে অন্যদের প্রতি, যেমন গার্হস্থ্য নির্যাতন। একজন ব্যক্তি তখনই অন্যের প্রতি অন্যায় করা থেকে বিরত থাকে যখন তারা তাদের কৃতকর্মের পরিণতির ভয় পায়, অর্থাত্ উভয় জগতেই মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে জবাবদিহিতা ও শাস্তি পেতে পারেন। কিন্তু নিজের কর্মের পরিণতির ভয়ের ভিত্তি ও মূল হল জ্ঞান। জ্ঞান ছাড়া কেউ কখনও তাদের কর্মের পরিণতিকে ভয় পায় না। এটি তাদের অজ্ঞতা তাদের পাপ করতে এবং অন্যদের প্রতি অন্যায় করতে উৎসাহিত করবে।

যদি সমাজ মানুষের বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য নির্যাতন এবং অন্যান্য অপরাধের ঘটনাগুলি হ্রাস করতে চায়, তবে তাদের অবশ্যই জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর

কাজ করার জন্য অগ্রাধিকার দিতে হবে, কারণ শুধুমাত্র উপাসনা এটি ঘটবে না, যেমন এটি বিদ্রোহীদের ইসলাম থেকে বিচ্যুত হতে বাধা দেয়নি এবং নিরপরাধ মানুষের জন্য বড় কষ্টের কারণ। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে তা হল সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজের মনোভাব। তিনি ছিলেন মহান সাহাবী এবং দ্বিতীয় সঠিক পথপ্রদর্শক খলিফা উমর বিন খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রপৌত্র। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, উমর বিন আব্দুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী ছিলেন না। তিনি প্রকৃতপক্ষে সাহাবীদের একজন অনুসারী ছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, অর্থাত্, তিনি কিছু সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তাঁর খিলাফত ব্যাপক দুর্নীতির সময়ে ঘটেছিল, যা আংশিকভাবে তাঁর পূর্ববর্তী খলিফাদের কারণে হয়েছিল যারা সঠিকভাবে পরিচালিত ছিল না। যদিও, তিনি মুসলিম জাতির দরিদ্র অবস্থা সংশোধন করার জন্য একাকী প্রচেষ্টা করেছিলেন, তবুও তিনি কখনও হাল ছেড়ে দেননি এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল ছিলেন। তিনি তার আগের কিছু খলিফার মতো তার কর্তৃত্ব ও প্রভাবের অপব্যবহার করেননি। পরিবর্তে, তিনি সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন এবং ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তাঁর ক্ষমতা ব্যবহার করেছিলেন।

মুসলমানদের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজে তারা যতই একাকীত্ব অনুভব করুক না কেন, ইসলামী শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হওয়ার অজুহাত হিসাবে তাদের ব্যবহার করা উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্য করে সৎ পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। উমর বিন আব্দুল আযীয যে, আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করেন, তিনি একজন সাহাবী ছিলেন না এবং তখনও তিনি দুর্নীতির দ্বারা বেষ্টিত ছিলেন, মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল ছিলেন, প্রমাণ করে যে মুসলমানদের জন্য এটি অর্জন করা সম্ভব যারা

নিজেদের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পান। একটি অনুরূপ অবস্থান। মহান আল্লাহর অবাধ্যতার সাথে অন্যদের শরীক করা, যখন এটি ব্যাপক হয়ে গেছে, তখন এটি একটি গ্রহণযোগ্য অজুহাত নয় এবং বিচারের দিনে মহান আল্লাহ তা অবশ্যই কবুল করবেন না। মুসলমানরা যদি মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকে এবং তাদের যা কিছু নিয়ামত ও প্রভাব আছে তা সঠিকভাবে ব্যবহার করে, তাহলে তারাও উমর বিন আব্দুল আজিজের মতো সফলতা লাভ করবে, আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ তাঁকে এতটাই আশীর্বাদ করেছিলেন যে তাঁর নাম ইতিহাসে মহান সাহাবীগণ এবং ইসলামের সঠিক পথপ্রদর্শক খলিফাদের পাশে স্থান পেয়েছে, যদিও তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবী ছিলেন না, শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। তার উপর। যে মুসলমানরা কার্যত তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তারা নিঃসন্দেহে তাদের সাথে পরবর্তী পৃথিবীতে শেষ হবে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 69:

"এবং যারা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করে - তারা তাদের সাথে থাকবে যাদের উপর আল্লাহ নবীদের অনুগ্রহ করেছেন, সত্যের অবিচল, শহীদ এবং সৎকর্মশীল। এবং তারা উত্তম সঙ্গী হিসাবে।"

মুসলমানদের প্রভাব

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে তা সুনানে আবু দাউদ, 4297 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে শীঘ্রই এমন একটি দিন আসবে যখন অন্যান্য জাতি মুসলিম জাতিকে আক্রমণ করবে এবং যদিও তারা সংখ্যায় বড় হবে, তবুও তারা বিশ্বের কাছে নগণ্য বলে বিবেচিত হবে। মহান আল্লাহ অন্যান্য জাতির অন্তর থেকে মুসলমানদের ভয় দূর করবেন। মুসলিম জাতিসমূহ বস্তুজগতের প্রতি ভালোবাসা এবং মৃত্যুর প্রতি তাদের ঘৃণার কারণে এটি ঘটবে।

সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তখনও সংখ্যায় কম ছিলেন, তারা সমগ্র জাতিকে পরাস্ত করেছিলেন, যেখানে মুসলিমরা আজ সংখ্যায় বেশি তবুও পৃথিবীতে তাদের সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রভাব নেই। এর কারণ এই যে, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের জীবন যাপন করতেন যাতে তারা পবিত্র কোরআনে এবং পবিত্র ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে। নবী মুহাম্মদ সা. অথচ বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমানই বিপরীত মানসিকতা অবলম্বন করেছে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত পাপের মূল হল জড় জগতের ভালবাসা। কারণ যে কোন পাপ সংঘটিত হয় তা ভালবাসা ও আকাঙ্ক্ষা থেকে করা হয়। বস্তুগত জগতকে চারটি দিকে বিভক্ত করা যেতে পারে: খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব এবং একজনের সামাজিক জীবন, যেমন তাদের আত্মীয় এবং বন্ধু। এই জিনিসগুলির অত্যধিক সাধনা যা পাপের দিকে পরিচালিত করে, যেমন ভাগ্যের প্রতি ভালবাসা থেকে অবৈধ সম্পদ উপার্জন করা। এ কারণেই জামি আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, সম্পদ ও কর্তৃত্বের প্রতি ভালোবাসা একজন ব্যক্তির ঈমানের জন্য যতটা ধ্বংসাত্মক, তার চেয়েও বেশি ধ্বংসকারী দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ভেড়ার পালকে ছেড়ে দিলে। মানুষ যখনই জড়জগতের এই দিকগুলোর আধিক্য খোঁজে, তখন তা সর্বদা প্রদত্ত নেয়ামতের অপব্যবহার

এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়। যখন এটি ঘটে তখন মহান আল্লাহর রহমত অপসারিত হয় যা উভয় জগতে সমস্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

যদিও, কিছু মুসলিম বিশ্বাস করে যে জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় অথচ বৈধ জিনিসের অনুসরণ করা ক্ষতিকারক নয়, এটি এমন একটি বিষয় যা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরুদ্ধে অনেক হাদিসে সতর্ক করেছেন যেমন সহীহ বুখারি, 3158 নম্বরে পাওয়া যায়। তিনি সতর্ক করেছিলেন যে তিনি মুসলমানদের জন্য দারিদ্রকে ভয় পান না। তার আশঙ্কা ছিল যে, মুসলমানরা এই জড় জগতের বিলাসিতা যেমন অতিরিক্ত সম্পদের পেছনে ছুটবে এবং এর ফলে তারা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে এবং এটি তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। এই হাদীসে যেমন সতর্ক করা হয়েছে, অতীতের জাতিদের মনোভাবও ছিল এই রকম।

বস্তুগত জগত যেহেতু সীমিত, তাই এটা স্পষ্ট যে, মানুষ যদি তাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি চায় তাহলে এর জন্য প্রতিযোগিতা করতে হবে। এই প্রতিযোগিতা তাদের এমন বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে বাধ্য করবে যা একজন প্রকৃত মুসলমানের চরিত্রের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, যেমন অন্যদের প্রতি হিংসা ও শত্রুতা। তারা একে অপরের যত্ন নেওয়া বন্ধ করবে, কারণ তারা জড়জগত জড়ো করা এবং মজুদ করার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। এবং তারা সহীহ বুখারি, 6011 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে প্রদত্ত উপদেশের বিরোধিতা করবে, যা পরামর্শ দেয় যে মুসলমানদের এক দেহের মতো আচরণ করা উচিত। শরীরের কোনো অংশ অসুস্থ হলে বাকি

অংশ ব্যথায় অংশ নেয়। এই প্রতিযোগিতা একজন মুসলিমকে অন্যদের জন্য ভালোবাসা বন্ধ করতে চালিত করবে যা তারা নিজের জন্য পছন্দ করে, যা জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে একজন সত্যিকারের বিশ্বাসীর বৈশিষ্ট্য , কারণ তারা পার্থিব বিষয়ে তাদের সহ-মুসলিমদের ছাড়িয়ে যেতে চায়। এই প্রতিযোগিতায় অটল থাকা একজন মুসলমানকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে বস্তুজগতের স্বার্থে ভালবাসবে, ঘৃণা করবে, দান করবে এবং আটকে রাখবে, যা সুনানে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। আবু দাউদ, সংখ্যা 4681। এই প্রতিযোগিতা সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, এবং আজকের অনেক মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য।

মুসলমানরা যদি একবার ইসলামের শক্তি ও প্রভাব পুনরুদ্ধার করতে চায়, তাহলে তাদের অবশ্যই পবিত্র কোরআনে বর্ণিত এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহারে মনোযোগ দিতে হবে। তার উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। এটি একটি স্বতন্ত্র স্তর থেকে ঘটতে হবে যতক্ষণ না এটি সমগ্র জাতিকে প্রভাবিত করে এবং এটি শেষ পর্যন্ত উভয় জগতেই মানসিক এবং শরীরের শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

বিচারের সঙ্গে মোকাবিলা

পরবর্তী যে মহান ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা করা হবে তা অনেক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন সহীহ মুসলিমের ৭৩৭৫ নম্বরে।

খ্রীষ্ট বিরোধীদের বিচারকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে, সুনানে ইবনে মাজা, 4077 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মুসলিমরা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে সবচেয়ে বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তাই ভবিষ্যতের এই ঘটনা থেকে মুসলমানদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নেওয়া উচিত। প্রথমটি হল দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী হওয়ার গুরুত্ব। দুর্বল ঈমানের অধিকারীরাই তার দ্বারা বিপথগামী হবে। দৃঢ় বিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি তাদের জীবনের প্রতিটি পরীক্ষা বা অসুবিধার বিরুদ্ধে একটি অস্ত্র। যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী সে সর্বদা, মহান আল্লাহর রহমতের মাধ্যমে, প্রতিদান এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যমে প্রতিটি অসুবিধাকে অতিক্রম করবে, কারণ তারা বুঝতে পারে যে প্রতিটি পরিস্থিতিতে তাদের প্রদর্শন করা উচিত। যেখানে দুর্বল ঈমানের অধিকারীরা সহজে বিপথগামী হয় এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিপথগামী হয়, তাদের জীবনে তারা যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হয়, ঠিক তেমনি দুর্বল ঈমানের লোকেরাও খ্রীষ্টবিরোধীদের দ্বারা বিপথগামী হয়। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি সে বিচারে আঘাত পায়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

দৃঢ় বিশ্বাস অর্জনের সর্বোত্তম উপায় হল ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করা। এটি একজন মুসলিমকে পরীক্ষা ও পরীক্ষার কারণ ও প্রজ্ঞা বুঝতে সাহায্য করবে। এর ফলে তারা ধৈর্য ধরে রেখে সফলভাবে তাদের কাটিয়ে উঠতে পারবে। ধৈর্যের মধ্যে রয়েছে নিজের কথা বা কাজের মাধ্যমে অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকা এবং মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখা। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা এর সাথে জড়িত।

এই মহান ঘটনা থেকে শেখার আরেকটি বিষয় হল সন্দেহজনক বিষয় এড়িয়ে চলার গুরুত্ব। যেভাবে একজন ব্যক্তি যে সীমান্তের কাছাকাছি যাত্রা করে, তার এটি অতিক্রম করার সম্ভাবনা বেশি, তেমনি একজন মুসলিম যে প্রলোভনে ঘেরা তার বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যে ব্যক্তি পাপের দিকে প্রলুব্ধ করে এমন স্থান ও জিনিস এড়িয়ে চলে সে তাদের ঈমান ও সম্মান রক্ষা করবে। জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তাই মুসলমানদের উচিত তাদের ঈমানের হেফাজত করা উচিত এমন জিনিস, স্থান এবং লোকেদের এড়িয়ে চলার মাধ্যমে যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ জানায় বা প্রলুব্ধ করে এবং তাদের নির্ভরশীলদের নিশ্চিত করে। যেমন তাদের সন্তানরাও তাই করে।

অন্ধ অনুকরণ

পরবর্তী যে মহান ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা করা হবে তা সহীহ মুসলিমের 375 নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে শেষ সময় আসবে না যতক্ষণ না তারা পৃথিবীতে অবশিষ্ট মুসলমানদের আহ্বান করবে। মহান আল্লাহর উপর।

এই মহান ঘটনাটি কর্মের মাধ্যমে সমর্থন না করে শুধুমাত্র জিহ্বা দিয়ে ইসলাম গ্রহণ না করার গুরুত্ব নির্দেশ করে: মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। যারা কেবল নামেই মুসলিম তারা আল্লাহকে ডাকে না বা তার উপর ভরসা করে না, যেমন করে তাদের আনুগত্য করে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 4049 নম্বরে পাওয়া শেষ সময় সম্পর্কিত আরেকটি হাদিস এমনকি ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যদের অন্ধ অনুকরণ না করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, যেমন একজনের পরিবার, ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ না করে যাতে কেউ অন্ধ অনুকরণকে ছাড়িয়ে যায় এবং আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে। , মহান, সত্যই তার প্রভুত্ব এবং তাদের নিজস্ব দাসত্ব স্বীকার করে . এটি আসলে মানবজাতির উদ্দেশ্য। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 56:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত ছাড়া সৃষ্টি করিনি।"

কীভাবে একজন সত্যিকারের উপাসনা করতে পারে যাকে তারা চিনতে পারে না? শিশুদের জন্য অন্ধ অনুকরণ গ্রহণযোগ্য কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কদের অবশ্যই জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সত্যিকার অর্থে অনুধাবন করে ধার্মিক পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। অজ্ঞতাই কারণ যে মুসলিমরা তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে তারা এখনও মহান আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করে। এই স্বীকৃতি একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের সময় নয়, সারা দিন আল্লাহর একজন প্রকৃত বান্দা হিসেবে আচরণ করতে সাহায্য করে। এর মধ্যে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত। এটি উভয় জগতের মন ও দেহের শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

শুধুমাত্র এর মাধ্যমেই মুসলমানরা মহান আল্লাহর প্রকৃত দাসত্ব পূর্ণ করবে। এবং এই অস্ত্র যা একজন মুসলিম তাদের জীবনের সমস্ত অসুবিধাকে অতিক্রম করে। যদি তারা এটির অধিকারী না হয়, তবে তারা পুরস্কার অর্জন ছাড়াই অসুবিধার সম্মুখীন হবে। প্রকৃতপক্ষে, এটি কেবল উভয় জগতেই আরও অসুবিধার দিকে পরিচালিত করবে। অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করা বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে পারে কিন্তু উভয় জগতে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য এটি প্রতিটি অসুবিধার মধ্য দিয়ে নিরাপদে পথ দেখাবে না। প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, অন্ধ অনুকরণ একজনকে তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পরিত্যাগের দিকে নিয়ে যায়। এই মুসলিম কেবল অসুবিধার সময় তাদের দায়িত্ব পালন করবে এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময় তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে বা বিপরীতে।

উপসংহারে, একজনকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে ইসলামে অন্ধ অনুকরণ গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ প্রতিটি মুসলমানকে অবশ্যই স্পষ্ট প্রমাণের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতাকে চিনতে হবে এবং তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানতে হবে, যাতে তারা প্রতিটি মুহুর্তে এবং নিঃশ্বাসে তা পূরণ করতে পারে। অন্ধ অনুকরণের কারণে একজন মুসলমান থাকতে পারে কিন্তু তা প্রতিটি পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অটল থাকবে না এবং এর ফলে তারা এই পৃথিবীতে মানসিক ও শারীরিক শান্তি পাবে না। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ কঠিন]..."

এবং অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 108:

"বল, "এটা আমার পথ; আমি অন্তর্দৃষ্টি সহকারে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাই, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করে...""

বার্ধক্য

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে তা হল বার্ধক্য। অধ্যায় 30 আর রুম, আয়াত 54:

"আল্লাহ সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে দুর্বলতা থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর দুর্বলতার পর শক্তি সৃষ্টি করেছেন, তারপর শক্তির পর দুর্বলতা ও সাদা চুল করেছেন..."

এটি এমন একটি ঘটনা যা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকা প্রত্যেক ব্যক্তি অনুভব করবে। এটা এড়ানো যাবে না। এই আয়াত এবং অন্যান্য শিক্ষাগুলি একজনের শারীরিক ও মানসিক শক্তি এবং মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত সময়কে কাজে লাগানোর গুরুত্ব নির্দেশ করে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম এই জিনিসগুলিকে হারানোর পরেই প্রশংসা করে। সহিহ বুখারি নম্বর 6412-এ পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বৃদ্ধ বয়সে উপনীত মুসলমানরা প্রায়শই মসজিদে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেয় যদিও তারা মসজিদের পূর্ণ ব্যবহার করার শক্তি রাখে না, যেমন শেখা এবং অভিনয়। ইসলামের শিক্ষার উপর। তারা প্রায়শই দাবি করে যে তারা শিখতে এবং আরও ভালোর জন্য পরিবর্তন করার জন্য খুব বেশি বয়সী। এবং এই আচরণের প্রধান সমস্যা হল যে তারা তাদের জীবনের কয়েক দশক বস্তুজগতে নিমগ্ন থাকার কারণে, এমনকি যদি তারা বৃদ্ধ বয়সে মসজিদে বসবাস করে, তবুও তাদের মন এবং হৃদয় বস্তুজগতে বিচরণ করে, কারণ এটিই তাদের রয়েছে। কখনো পরিচিত যারা নিয়মিত মসজিদে যান তাদের কাছে এটি বেশ স্পষ্ট।

উপরন্তু, কেউ যে বার্ধক্যে পৌঁছাবে তার কোন গ্যারান্টি নেই, তাই একজন ব্যক্তির মনে করা উচিত নয় যে তারা তাদের আয়ুতে পৌঁছে যাবে। পরিবর্তে, তাদের উচিত যে প্রতিটি মুহূর্ত তাদের দেওয়া হয়েছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা উচিত যাতে তারা উভয় জগতে ভাল পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক সাফল্য লাভ করে। অন্যথায়, তারা এই পৃথিবীতে শান্তি পাবে না, কারণ তারা তাদের দেওয়া নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদের পার্থিব সাফল্য এই দুনিয়ার সাথেই চলে যাওয়ায় হাশরের দিনে তাদের অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

ইসলাম তাদের যৌবনকালে বস্তুগত জগতকে পরিত্যাগ করতে শেখায় না তবে এটি মুসলমানদেরকে অন্য সব কিছুর চেয়ে মহান আল্লাহর আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পরামর্শ দেয়, কারণ এটিই উভয় জগতের মানসিক ও দেহের শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

তাই যৌবনের বরকত হারানোর সময় পৌঁছানোর আগেই তাদের যৌবনকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা উচিত। যে ব্যক্তি তাদের যৌবনকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে তারা বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হওয়ার পর একই পুরস্কার পাবে, এমনকি যদি তারা আগের মতো ভালো কাজ করতে না পারে। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 500 নং হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের যৌবনকে অর্থহীন কাজে নষ্ট করে, তার জন্য কেবল আফসোস থাকবে যদি তারা বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়।

পিতামাতাদের অবশ্যই তাদের সন্তানদেরকে বিশ্বের সাফল্যের দিকে ঠেলে দেওয়ার এবং আধ্যাত্মিক সাফল্যের জন্য তাদের উত্সাহিত করতে বিলম্ব করার সাধারণ মনোভাবকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। যে শিশুটি তাদের বেশিরভাগ প্রচেষ্টাকে বিশ্বের জন্য উত্সর্গ করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, তারা বড় হয়ে গেলে জাদুকরীভাবে তাদের মনোভাব পরিবর্তন করবে না। এটি কেবল উভয় জগতের পিতামাতা এবং সন্তানদের জন্য একটি বড় বোঝার দিকে নিয়ে যায়। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক বাবা-মা এই বিষয়টি বুঝতে ব্যর্থ হন।

মৃত্যু

পরবর্তী মহান ঘটনা যা নিয়ে আলোচনা করা হবে তা হল এমন কিছু যা প্রতিটি সৃষ্টিই অনুভব করবে যথা মৃত্যু। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 185:

"প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং কেয়ামতের দিন কেবলমাত্র তোমাদের [পূর্ণ] ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। সুতরাং যে জাহান্নাম থেকে দূরে সরে গেছে এবং জান্নাতে প্রবেশ করেছে সে [তার ইচ্ছা] অর্জন করেছে। আর পার্থিব জীবন ছলনার ভোগ ছাড়া আর কি আছে।"

মৃত্যু এমন একটি জিনিস যা ঘটবে নিশ্চিত কিন্তু সময়টি অজানা, তাই এটা বোঝা যায় যে একজন মুসলিম যে পরকালে বিশ্বাস করে সে তার জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেয় এমন জিনিসগুলির জন্য প্রস্তুতির চেয়ে যা ঘটতে পারে না, যেমন বিয়ে, সন্তান বা তাদের অবসর। এটা আশ্চর্যজনক যে কত মুসলমান বিপরীত মানসিকতা অবলম্বন করেছে যদিও তারা সাক্ষ্য দেয় যে দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং অনিশ্চিত অথচ আখেরাত চিরস্থায়ী এবং তাদের পৌঁছানো নিশ্চিত। কেউ যেভাবে আচরণ করুক না কেন তাদের কাজের ব্যাপারে তাদের বিচার করা হবে। একজন মুসলমানকে বিশ্বাস করে বোকা বানানো উচিত নয় যে তারা ভবিষ্যতে পরকালের জন্য প্রস্তুত করতে পারে এবং করবে কারণ এই মনোভাব তাদের মৃত্যু ঘটতে না হওয়া পর্যন্ত তাদের আরও বিলম্বিত করে এবং তারা অনুশোচনা নিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায় যা তাদের সাহায্য করবে না।

তাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই নয় যে মানুষ মারা যাবে, কারণ এটি অনিবার্য, তবে মূল বিষয় হল এমনভাবে কাজ করা যাতে কেউ এর জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত থাকে। এর জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার একমাত্র উপায় হল ইসলামের শিক্ষার উপর আমল করা, অর্থাৎ মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হওয়া। তার উপর। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এটি তখনই সম্ভব যখন কেউ ঘটতে না পারে এমন জিনিসগুলির জন্য প্রস্তুতির চেয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেয় ।

একজন মুসলমানকে এই বাস্তবতা দ্বারা প্রতারিত করা উচিত নয় যে একজন ব্যক্তি প্রায়শই এই পৃথিবীতে দ্বিতীয় সুযোগ পায় এবং এই মনোভাবটি মৃত্যুর জন্য প্রয়োগ করে। মৃত্যু আসার সময় দ্বিতীয় কোন সুযোগ বা বিলম্ব নেই। উপরন্তু, একজনকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে যদি তারা মৃত্যু ও পরকালের প্রতি উদাসীন জীবনযাপন করে, তবে তারা সেই অবস্থায় মারা যাবে। যদি তারা গাফিলতির অবস্থায় মারা যায়, তবে তারা একই অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে। এই ব্যক্তি বিচারের দিনে তারা যে সাফল্য কামনা করে তা খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এটি সহীহ মুসলিমের 7232 নম্বর হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কবর

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে যখন একজন ব্যক্তি তাদের কবরে প্রবেশ করে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 55:

"এটি থেকে [অর্থাৎ, পৃথিবী] আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি, এবং তাতেই আমরা তোমাদের ফিরিয়ে দেব এবং তা থেকে আমরা আবারও তোমাদের বের করব।"

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক আয়াত ও হাদিস এই পর্যায়ে আলোচনা করে যা সকল মানুষ কোন না কোন আকারে বা ফ্যাশনে মুখোমুখি হবে। যেহেতু এটা অবশ্যম্ভাবী, তাই মুসলমানদের অবশ্যই এর জন্য প্রস্তুত হতে হবে, কারণ কবরের আলো বা অন্ধকার কবর থেকে আসে না। এটা তার কর্ম যা তার কবরকে অন্ধকার করে বা আলোকিত করে। একইভাবে, এটি একজনের কাজ যা নির্ধারণ করে যে তারা তাদের কবরে শাস্তি বা করুণার সম্মুখীন হবে কিনা। এর জন্য প্রস্তুত হওয়ার একমাত্র উপায় হল মহান আল্লাহর আনুগত্য করা, যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। তার উপর। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলি প্রদত্ত হয়েছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে।

মুসলমানরা প্রায়ই তাদের আত্মীয় এবং বন্ধুদের কবর দেওয়ার জন্য কবরস্থানে যান। কিন্তু খুব কম লোকই সত্যিই বুঝতে পারে যে একদিন, শীঘ্রই বা পরে, তাদের পালা আসবে। যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান তাদের পরিবারকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার চেয়ে সম্পদ উপার্জনের জন্য তাদের প্রচেষ্টার সিংহভাগ উৎসর্গ করে, সৎ কাজের মাধ্যমে, জামে আত তিরমিযী, 2379 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে এই দুটি জিনিস যা মুসলমানরা দেয়। অগ্রাধিকার তাদের কবরে পরিত্যাগ করবে এবং শুধুমাত্র তাদের আমল তাদের সাথে থাকবে। অতএব, একজন মুসলমানের জন্য তাদের পরিবারকে খুশি করার জন্য এবং অতিরিক্ত সম্পদ অর্জনের জন্য নেক আমল অর্জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া বোধগম্য। এর অর্থ এই নয় যে কেউ তাদের পরিবার এবং সম্পদ পরিত্যাগ করবে। কিন্তু এর অর্থ হল, মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্যকে অবহেলা না করে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের পরিবারের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করা উচিত এবং এটি অর্জনের জন্য তাদের প্রয়োজন শুধুমাত্র পার্থিব জিনিস যেমন সম্পদ অর্জন করা। যখন এটি সঠিকভাবে করা হয়, এটি একটি সৎ কাজও হয়ে যায়। এটি সহীহ বুখারি, 4006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। পার্থিব জিনিস যেমন তাদের পরিবার বা সম্পদের জন্য মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্যকে কখনোই ত্যাগ করা উচিত নয়, কারণ এটি কেবল তাদের নেয়ামতের অপব্যবহার করতে বাধ্য করবে। তাদের মঞ্জুর করা হয়েছে। এটি পরিবর্তে একটি বিচ্ছিন্ন, একাকী এবং অন্ধকার কবরের দিকে নিয়ে যাবে।

ট্রাম্পেট

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে তা হল ট্রাম্পেট বিস্ফোরণ যা বিচার দিবসের আগে ঘটবে। তূর্য বিস্ফোরণে সৃষ্টির মৃত্যু ঘটবে। এটি সহীহ মুসলিম, 7381 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। শেখার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এটি এমন একটি কল যা কেউ সাড়া দিতে পারে না বা প্রত্যাখ্যান করবে না। এটি পুনরুত্থান এবং চূড়ান্ত বিচারের দিকে পরিচালিত করবে। তাই মুসলমানদের উচিৎ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর আহবানে সাড়া দেওয়া, আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। অধ্যায় 8 আন আনফাল, আয়াত 24:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকেন যা তোমাদের জীবন দেয়..."

এই পৃথিবীতে যে কেউ এই আহ্বানে সাড়া দেবে, সে চূড়ান্ত আহ্বানকে সহ্য করা এবং সাড়া দেওয়া সহজ পাবে। অথচ যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহ তায়ালার আহবানের প্রতি অমনোযোগী জীবনযাপন করে, তাদের দেয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে সেখানে শান্তি পাবে না এবং তারা শিঙ্গার ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য হবে। তাদের সহ্য করা এবং সাড়া দেওয়ার জন্য একটি বড় বোঝা। একজন ব্যক্তি কেবলমাত্র মহান আল্লাহর আহ্বানকে এতদিন উপেক্ষা করতে পারে, যতক্ষণ না চূড়ান্ত আহ্বান আসবে, শীঘ্র বা পরে, এবং কেউ তা এড়াতে বা উপেক্ষা করতে সক্ষম হবে না। যদি এটি অনিবার্য হয়, তবে এটা

বোঝা যায় যে কেউ গাফিলতিতে জীবনযাপন করার পরিবর্তে এখনই এর প্রতিক্রিয়া জানায়। যদি কেউ গাফেল অবস্থায় শিঙার বিস্ফোরণ শুনতে পায়, তবে কোন কাজ বা অনুশোচনা তাদের উপকারে আসবে না এবং এই ব্যক্তির জন্য যা হবে তা আরও ভয়ঙ্কর হবে।

বিচার দিবসে আত্মীয়স্বজন

পরবর্তী মহান ঘটনাটি যা আলোচনা করা হবে তা 80 আবাসা, 34-37 নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

"যেদিন মানুষ তার ভাইয়ের কাছ থেকে পলায়ন করবে। এবং তার মা এবং তার বাবা। এবং তার স্ত্রী এবং তার সন্তানদের। প্রতিটি মানুষের জন্য, সেই দিনটি তার জন্য যথেষ্ট হবে।"

এটি সেই সময় যখন প্রতিটি ব্যক্তি বিচারের দিনে তাদের আত্মীয়দের কাছ থেকে তাদের নিজেদের মঙ্গলের উদ্বেগ থেকে পালিয়ে যাবে। মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলাম তাদের আত্মীয়দের পরিত্যাগ করার পরামর্শ দেয় না, কারণ আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা ইসলামের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু এটি তাদের প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে তাদের সঠিক জায়গায় রাখতে উত্সাহিত করে। এর অর্থ এই যে, তাদের উচিত অন্যের অধিকার আদায় করা, অর্থের সীমারেখা না নিয়ে, মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্বের সাথে আপোষ না করে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য অনুসরণ করা। দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ অনেক দূরে চলে যায় এবং তাদের আত্মীয়দের প্রতি ভুল ভালবাসা এবং আনুগত্যের কারণে এই আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলি পরিত্যাগ করে। এর ফলে তারা তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে। এমনকি কেউ কেউ হারাম রিযিক লাভের চেষ্টা করে এবং আত্মীয়-স্বজনদের খুশি করার জন্য পাপ করে। এই মহান ঘটনা স্পষ্টভাবে এটা করার খারাপ দিক দেখায়. একজন মুসলিমের উচিত সবসময় অন্যদেরকে, বিশেষ করে তাদের আত্মীয়দের, ভালো কিছুতে সমর্থন করা কিন্তু কখনোই খারাপ কাজে তাদের সমর্থন করা উচিত নয়, তাদের সাথে তাদের বন্ধন যতই ঘনিষ্ঠ হোক না কেন, কারণ সৃষ্টির কোনো আনুগত্য

নেই যদি তা আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়। শ্রেষ্ঠ অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

উপরন্তু, এই মহান ইভেন্টটি এমন লোকেদের মধ্যে ঘটবে যারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একজন ব্যক্তির থেকে তাদের বন্ধুদের সাথে গভীর সংযোগ ভাগ করে নেয়। তাহলে বিচার দিবসে আত্মীয়-স্বজনের পরিণতি যদি এমন হয়, বন্ধুদের পরিণতি কি কেউ কল্পনা করতে পারে? 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 28:

"হায়, হায় আমার! আমি যদি তাকে বন্ধু হিসাবে না নিতাম।"

এই পৃথিবীতে বা পরকালে মানুষদের সত্যিকার অর্থে একে অপরের উপকার করার একমাত্র উপায় হল যখন তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দেয় , যার মধ্যে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হিসাবে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা জড়িত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য সব কিছুর উপরে এবং এই চূড়ান্ত লক্ষ্যে একে অপরকে সাহায্য করে। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া"

ছায়া

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচিত হবে তা হল কিয়ামতের দিন যখন সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে নিয়ে আসা হবে। এটি সহীহ মুসলিম, 2864 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

এর ফলে মানুষ পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে যে কাজগুলো করেছে সে অনুযায়ী ঘাম ঝরাবে। কারো ঘাম পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত এবং কারো মুখ পর্যন্ত পৌঁছাবে।

একজনকে শুধুমাত্র গভীর গ্রীষ্মের আবহাওয়ার শিকার হওয়ার সময় এবং বিচার দিবসের তাপকে উপলব্ধি করার জন্য তাপ তাদের মনোভাব এবং আচরণকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল তা নিয়ে চিন্তা করতে হবে।

এই ঘটনাটি দেখায় যে যারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা চালায়, তারা যে আশীর্বাদগুলিকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত হয়েছিল, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে, শান্তি ও বরকত, বিচার দিবসে শিথিলতা পাবেন। কিন্তু যারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলোকে নিরর্থক এবং পাপপূর্ণ উপায়ে ব্যবহার করেছে তারা বিচারের দিনে বড় চাপের শিকার হবে। সোজা কথায়, যে মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করে, সে এখানে শিথিল হবে কিন্তু যে এখানে শিথিল হবে সে সেখানে কষ্ট করবে। অধ্যায় 56 আল ওয়াকিয়াহ, আয়াত 88-89:

"এবং যদি সে [মৃত] [আল্লাহর] নিকটবর্তীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে [তার জন্য] বিশ্রাম রয়েছে..."

এই জড় জগতে মানুষ যেভাবে কঠোর পরিশ্রম করে যাতে তারা একটি আরামদায়ক জীবন এবং এমনকি একটি আরামদায়ক অবসর পেতে পারে, যদিও এই অবসর বয়সে পৌঁছানো নিশ্চিত করা হয় না, মুসলমানদের উচিত এই পৃথিবীতে সর্বোত্তম মহান আল্লাহকে মেনে চলার মাধ্যমে আরও কঠোর প্রচেষ্টা করা। তাদের জীবনের দিকগুলি, যাতে তারা এই পৃথিবীতে শান্তি এবং আরাম পায় এবং এমন একটি দিনে যা ঘটবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এমন একটি দিনের জন্য সংগ্রাম করা বড় অজ্ঞতার চিহ্ন যা কখনোই পৌঁছাতে পারে না, অর্থাৎ অবসর গ্রহণের দিন, এবং এমন একটি দিনের জন্য চেষ্টা না করা যেখানে তারা পৌঁছানোর গ্যারান্টিযুক্ত এবং যেমন বিচার দিবস।

মধ্যস্থতা

পরবর্তী যে মহান ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা করা হবে তা হল কিয়ামতের দিন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুপারিশ। সুনানে ইবনে মাজাহ, 4308 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শ দিয়েছেন যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি সুপারিশ করবেন এবং প্রথম ব্যক্তি যার সুপারিশ বিচারের সময় মহান আল্লাহ কবুল করবেন। দিন।

তাই একজন মুসলমানের উচিত নিজেদেরকে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াতের যোগ্য করে তোলার জন্য সচেষ্ট হওয়া, যার ফলশ্রুতিতে এই কাজগুলো করা হয়, যেমন নামাযের আযান শোনার পর এর জন্য দোয়া করা। সুনানে আন নাসাই, নম্বর 679-এ পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এর জন্য একজনকে নিয়মিতভাবে মসজিদে ফরজ নামাজে অংশ নিতে হবে, বরং বাড়িতে নামাজ পড়তে হবে। সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম যা সুপারিশের ফলস্বরূপ হবে তা হ'ল মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত শেখা এবং আমল করা। একজন মুসলিমের এই দায়িত্ব প্রত্যাখ্যান করে গাফিলতিতে জীবনযাপন করা উচিত নয় এবং তারপর বিচারের দিনে সুপারিশের আশা করা উচিত, কারণ এটি মহান আল্লাহর রহমতে সত্যিকারের আশার তুলনায় ইচ্ছাপূর্ন চিন্তার কাছাকাছি, যা দোষের যোগ্য এবং বাস্তব মূল্যহীন।

দুর্ভাগ্যবশত, কিছু মুসলিম যারা এই ইচ্ছাপূর্ন চিন্তাধারা গ্রহণ করেছে তারা এই সুপারিশের মাধ্যমে জান্নাত লাভের আশা করে যদিও তারা মহান আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং পবিত্র ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। নবী মুহাম্মদ সা. এই

মুসলিমদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে যদিও সুপারিশ একটি সত্য, কিছু মুসলিম যাদের সুপারিশের মাধ্যমে তাদের শাস্তি হ্রাস করা হবে, তারা এখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এমনকি জাহান্নামে একটি মুহূর্তও সত্যিই অসহনীয়। তাই ইচ্ছাকৃত চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে বাস্তবিকভাবে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যে সংগ্রাম করে প্রকৃত আশাকে গ্রহণ করা উচিত, যা তারা প্রদত্ত নেয়ামতকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে।

উপরন্তু, যে মুসলিম মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকে এবং ধরে নেয় যে তারা এই সুপারিশের মাধ্যমে নাজাত পাবে তাদের অবশ্যই এই বাস্তবতাকে মেনে নিতে হবে যে, তাদের অবাধ্যতা এবং উপহাসমূলক মনোভাবের কারণে তারা তাদের বিশ্বাস নিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে যেতেও পারবে না। অতএব, এই মুসলমানকে বিচার দিবসে এই সুপারিশ পাওয়ার চেয়ে একজন মুসলিম হিসাবে মৃত্যু নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হতে হবে, যা শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত।

দাঁড়িপাল্লা

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে যখন একজন ব্যক্তির কাজ; ভাল এবং খারাপ, তাদের চূড়ান্ত বিচারের জন্য বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় স্থাপন করা হবে। এই মহান ঘটনাটি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর হাদিস জুড়ে আলোচিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 101 আল ক্বারিয়াহ, আয়াত 6 থেকে 9:

"অতঃপর যার পাল্লা ভারী হয় [ভালো আমলে]। তিনি একটি সুখী জীবন হবে. কিন্তু যার দাঁড়িপাল্লা হালকা। তার আশ্রয় হবে অতল গহ্বর।"

মুসলমানদের জন্য নিয়মিতভাবে তাদের নিজেদের কর্মের মূল্যায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তাদের সম্পর্কে নিজেদের চেয়ে ভালো জানেন না। যখন কেউ সততার সাথে তাদের নিজের কাজগুলি বিচার করে তখন এটি তাদের তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করবে এবং সৎ কাজ করার জন্য তাদের উত্সাহিত করবে, যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের আমলের নিয়মিত মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়, সে গাফিলতির জীবন যাপন করবে যেখানে তারা তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করবে। এই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাদের কৃতকর্মের ওজন করা অত্যন্ত কঠিন মনে করবে। প্রকৃতপক্ষে, এটি তাদের জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে পারে।

একজন চতুর ব্যবসার মালিক সর্বদা তাদের অ্যাকাউন্টগুলি নিয়মিত মূল্যায়ন করবে। এটি তাদের ব্যবসার সঠিক দিক নিশ্চিত করবে এবং নিশ্চিত করবে যে তারা ট্যাক্স রিটার্নের মতো সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঠিকভাবে সম্পন্ন করেছে। কিন্তু মূর্খ ব্যবসার মালিক নিয়মিত তাদের ব্যবসার হিসাব নেবে না। এটি লাভের ক্ষতি এবং তাদের অ্যাকাউন্টের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতিতে ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করবে। যারা সরকারের কাছে সঠিকভাবে তাদের হিসাব জমা দিতে ব্যর্থ হয় তারা শাস্তির সম্মুখীন হয় যা তাদের জীবনকে আরও কঠিন করে তোলে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লার জন্য একজনের কাজ সঠিকভাবে মূল্যায়ন এবং প্রস্তুত করতে ব্যর্থতার শাস্তিতে আর্থিক জরিমানা জড়িত নয়। এর শাস্তি আরও কঠোর এবং সত্যিকার অর্থে অসহনীয়। অধ্যায় 99 Az Zalzalah, আয়াত 7-8:

"সুতরাং যে ব্যক্তি একটি অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে। আর যে কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।"

পরিশেষে, একজন মুসলমানকে কেবল পাপ করাই এড়াতে হবে না বরং তাদের দান করা আশীর্বাদগুলোকে নিরর্থক উপায়ে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। নিরর্থক জিনিসগুলি পাপী নাও হতে পারে তবে যেহেতু সেগুলি সৎ কাজ নয়, তাই বিচারের দিনে তারা অনুশোচনার দিকে নিয়ে যাবে, বিশেষ করে যখন কেউ বুঝতে পারে যে তারা যে নিরর্থক কাজগুলি করেছে তা যদি তারা ব্যবহার করত তবে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লার ভাল দিকে রাখা যেত। আশীর্বাদ সঠিকভাবে। কিছু ক্ষেত্রে, দাঁড়িপাল্লার দুই পক্ষের মধ্যে সামান্য পার্থক্য পরিত্রাণ এবং অভিশাপের মধ্যে পার্থক্য হতে পারে।

অজুহাত

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, 22 আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

"এবং শয়তান যখন বিষয়টি শেষ হবে তখন বলবে, "নিশ্চয়ই, আল্লাহ তোমাকে সত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এবং আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। কিন্তু আমি তোমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম ছাড়া তোমার উপর আমার কোন কর্তৃত্ব ছিল না এবং তুমি তাতে সাড়া দিয়েছিলে। তাই আমাকে দোষারোপ করো না বরং নিজেদেরকে দোষারোপ করো।

এটা হল যখন বিচারের দিনে লোকেরা তাদের পাপের জন্য শয়তানকে দোষারোপ করার চেষ্টা করবে যাতে তাদের শাস্তির বোঝা তার কাছে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু এই আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে এটি একটি নিরর্থক এবং মূর্খ অজুহাত, যেহেতু শয়তান শুধুমাত্র মানুষকে পাপ করার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করে, সে শারীরিকভাবে কাউকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার জন্য বাধ্য করতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তি সঠিকভাবে বা ভুলভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে মহান আল্লাহকে মান্য বা অমান্য করার একটি পছন্দ করে এবং তাই তাদের পছন্দের পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত, কিছু এই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বুঝতে না. তারা প্রায়শই পাপ করে এবং হয় অন্যকে দোষারোপ করে ঘোষণা করে যে তারা এইভাবে কাজ করতে নিশ্চিত ছিল বা তারা ঘোষণা করে যে অন্যরা প্রকাশ্যে পাপ করছে এটি তাদের একইভাবে কাজ করার লাইসেন্স দেয়। একইভাবে একটি পার্থিব আদালতে একজন বিচারক কখনই এই অজুহাত গ্রহণ করবেন না এবং বিচার দিবসে মহান আল্লাহও গ্রহণ করবেন না। মুসলমানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা সংস্কৃতি বা ফ্যাশনকে তাদের আচরণের মানদণ্ডে

পরিণত করবে না, কারণ এটি তাদের বিপথগামী করবে এবং বিচার দিবসে তাদের কোন বৈধ অজুহাত থাকবে না। পরিবর্তে, তাদের ইসলামের শিক্ষাগুলি মেনে চলা উচিত যা সহজভাবে বর্ণনা করে যে একজন ব্যক্তির কীভাবে সমস্ত পরিস্থিতিতে আচরণ করা উচিত। সময় এসেছে মুসলমানরা শিশুসুলভ অজুহাত ত্যাগ করে এবং আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে তাদের সন্তুষ্ট করার উপায়ে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। , তারা এমন দিনে পৌঁছানোর আগেই যেদিন তাদের অজুহাত মহান আল্লাহ কবুল করবেন না। মহান আল্লাহ যদি শয়তানকে তাদের প্রকাশ্য শত্রু হিসেবে দোষারোপকারীদের অজুহাত প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার প্রতিশ্রুতি দেন, তাহলে মহান আল্লাহ তার অবাধ্যতার অন্য কোন অজুহাত কিভাবে গ্রহণ করবেন?

স্বর্গীয় পুল

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে তা হল যখন মুসলমানরা শেষ বিচারের দিনে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদত্ত স্বর্গীয় পুল থেকে পান করে এবং পান করে। অনেক হাদিস আছে যা আকাশের পুল নিয়ে আলোচনা করে, যেমন সহীহ বুখারি, নম্বর 6579 এ পাওয়া যায়। এটি পরামর্শ দেয় যে এটির পুরো দৈর্ঘ্য অতিক্রম করতে এক মাস সময় লাগে, এর গন্ধ পারফিউমের চেয়ে সুন্দর, এর পানি দুধের চেয়ে সাদা এবং যে একবার তা থেকে পান করবে, সে আর কখনো পিপাসা পাবে না। শেষ বিন্দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিচার দিবসে লোকেরা একটি চরম এবং অকল্পনীয় তৃষ্ণা অনুভব করবে। যেমন সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে নিয়ে আসা হবে যার কারণে মানুষ অতিরিক্ত ঘামবে। জামি আত তিরমিযী, 2421 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

কোন সন্দেহ নেই যে প্রত্যেক মুসলমান এই পুকুর থেকে পান করতে চায়, তাদের বিশ্বাসের শক্তি নির্বিশেষে। কিন্তু এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলমানের উচিত কেবল এটি অর্জনের আশা না করে নিজেকে এটি থেকে পান করার যোগ্য করে তোলার চেষ্টা করা। মহান আল্লাহর হুকুম পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে এটি অর্জন করা হয়।

উপরন্তু, মুসলমানদের অবশ্যই মহান আল্লাহর অবাধ্যতা এড়িয়ে চলতে হবে, বিশেষ করে সেই সমস্ত কাজ যা কাউকে স্বর্গীয় পুকুরে পৌঁছাতে বাধা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, 5996 নম্বর, সতর্ক করে যে কিছু মুসলিম যারা ইসলামে খারাপ জিনিস উদ্ভাবন করেছে তাদের আটক

করা হবে এবং স্বর্গীয় পুকুরে পৌঁছাতে বাধা দেওয়া হবে। সুনান আন নাসাইতে পাওয়া আরেকটি হাদিস, 4212 নম্বর, সতর্ক করে যে যারা অন্যায়কারী শাসকদের মিথ্যা ও ভুল কাজকে সমর্থন করে এবং বিশ্বাস করে তারা স্বর্গীয় পুকুরে পৌঁছাবে না। সুতরাং, যারা স্বর্গীয় জলাশয় পর্যন্ত পৌঁছতে এবং পান করতে ইচ্ছুক মুসলমানদের জন্য মহান আল্লাহর অবাধ্যতা এড়াতে এবং তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করা গুরুত্বপূর্ণ।

সেতু

পরবর্তী মহান ঘটনাটি যা আলোচনা করা হবে তা হল যখন মানুষকে সেতুটি অতিক্রম করার আদেশ দেওয়া হবে যা বিচারের দিন জাহান্নামের উপর স্থাপন করা হবে। এটি ইসলামিক শিক্ষায় ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন সহীহ বুখারি, 6573 নম্বর হাদিস পাওয়া গেছে। এটি সতর্ক করে যে সেতুর উপর অত্যন্ত বড় হুক থাকবে যা তাদের কাজ অনুসারে মানুষকে প্রভাবিত করবে। কেউ কেউ তাদের দ্বারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, কেউ কেউ সেতু পার হওয়ার আগে প্রচণ্ড অত্যাচারের শিকার হবে, অন্যরা তাদের থেকে সামান্য আঘাতের সম্মুখীন হবে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের দ্বারা ধার্মিকদের কোন ক্ষতি হবে না। সহিহ মুসলিমে পাওয়া আরেকটি হাদিস, 455 নম্বর, সতর্ক করে যে সেতুটি চুলের স্ট্র্যান্ডের চেয়ে সরু এবং তরবারির চেয়েও ধারালো।

এখান থেকে শেখার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের কর্ম অনুযায়ী সেতু অতিক্রম করবে। তাই মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে তারা নিরাপদে সেতু পার হতে চাইলে কোনো কর্তব্য অবহেলা না করা। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী তাদেরকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলো ব্যবহার করে তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে। একজনের এটিকে অবহেলা করা উচিত নয় এবং কেবল আশা করা উচিত যে তারা যাদুকরীভাবে সেতুটি অপ্রতিরোধ্যভাবে অতিক্রম করবে।

উপরন্তু, একজন ব্যক্তি যে স্বাচ্ছন্দ্যে এই সেতুটি অতিক্রম করবে তা একটি দর্পণ হবে যে তারা এই পৃথিবীতে ইসলামের সরল পথে কতটা অবিচল ছিল। এই সরল পথ পবিত্র কুরআনের পথ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

যে কেউ এই পথ পরিত্যাগ করবে সে সফলভাবে এই সেতু পার হতে পারবে না। সহজ কথায়, এই পৃথিবীতে যত বেশি মানুষ সরল পথে অটল থাকবে, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শিখে ও আমল করার মাধ্যমে, সে তত সহজে জাহান্নামের সেতু অতিক্রম করবে। বিচার এর দিন। এই পৃথিবীতে সরল পথ সুস্পষ্ট করা হয়েছে, তাই মানুষের কোন অজুহাত নেই।

জাহান্নাম

পরবর্তী মহান ঘটনা যা আলোচনা করা হবে যখন বিচার দিবসে ব্যর্থ ব্যক্তিদের জাহান্নামে পাঠানো হবে। পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসে জাহান্নামের বহুল পরিচিত দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তাই সেগুলো এখানে আলোচনা করা হবে না। কিন্তু মনে রাখার বিষয় হল যে প্রত্যেক ব্যক্তি যারা জাহান্নামে শেষ হবে, তারা তাদের পাপের আকারে এই দুনিয়া থেকে তাদের সাথে জাহান্নামে যে আগুনের মুখোমুখি হবে তা গ্রহণ করে। যখন একজন মুসলমান এই বাস্তবতা তাদের মনের মধ্যে খোদাই করে, তখন তারা প্রতিটি পাপ, বড় বা ছোট, অসহনীয় আগুনের টুকরো হিসাবে পর্যবেক্ষণ করবে। একজন ব্যক্তি যেভাবে দুনিয়াতে আগুনকে এড়িয়ে চলে, সেভাবে তাদের পাপ থেকে বেঁচে থাকা উচিত কারণ এটি একটি গোপন আগুন যা তাদের পরকালে দেখানো হবে।

উপরন্তু, একজন মুসলমানের গাফিলতিতে জীবনযাপন করা উচিত নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত যে তারা এই মৌখিক সমর্থন ছাড়াই কেবল আল্লাহ, মহান, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং সাহাবীগণের প্রতি ভালবাসা দাবি করতে পারে। কর্ম সহ ঘোষণা। যদি এটি সত্য হত, তবে সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, মহান আল্লাহর আনুগত্যে এত কঠোর পরিশ্রম করতেন না এবং তারা নিঃসন্দেহে ইসলাম ও বিচার দিবসকে তাদের পরবর্তী লোকদের চেয়ে ভাল বুঝতেন। সহজ কথায়, কর্ম ছাড়া প্রেমের ঘোষণা কাউকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে, এটা স্পষ্ট করা হয়েছে যে বিচার দিবসে কিছু মুসলিম জাহান্নামে প্রবেশ করবে। যে মুসলমান মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করা ত্যাগ করে, তাদের প্রদত্ত নিয়ামতগুলিকে ব্যবহার করে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, তাদের বোঝা উচিত যে তাদের মনোভাব তাদের মৃত্যুর আগে তাদের বিশ্বাস হারাতে

পারে যাতে তারা বিচার দিবসে অমুসলিম হিসাবে প্রবেশ করে, যা সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

বর্ম ও ঢাল ব্যতীত যেভাবে যুদ্ধে প্রবেশ করা যায় না, তেমনি একজন মুসলমানও মহান আল্লাহর আনুগত্যের বর্ম ও ঢাল ছাড়া হাশরের দিনে প্রবেশ করবে না। অন্যথায়, যে সৈনিকের কোন সুরক্ষা নেই সে একইভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে, তেমনি একজন মুসলমান যিনি বিচার দিবসে পৌঁছে যাবেন আল্লাহর আনুগত্য দ্বারা প্রদত্ত সুরক্ষা ছাড়াই। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে তারা যে বস্তুজগতের ভোগ-বিলাস ও ভোগ-বিলাস উপভোগ করেছে তা জাহান্নামে শেষ হলে তাদের ভালো লাগবে না। আসলে, এটা তাদের খারাপ বোধ করবে।

জান্নাত

পরবর্তী মহান ঘটনাটি আলোচনা করা হবে যখন মহান আল্লাহর নেক বান্দারা বিচার দিবসে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এটা মনে রাখা জরুরী, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সহীহ বুখারী, 5673 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। কারণ প্রতিটি সৎ কাজ জ্ঞান, অনুপ্রেরণা, শক্তি এবং আমল করার সুযোগের মাধ্যমে একমাত্র মহান আল্লাহর রহমতে সম্ভব। এই বোধগম্যতা একজনকে অহংকার গ্রহণ করতে বাধা দেয় যা এড়ানো অত্যাবশ্যক, কারণ একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য শুধুমাত্র একটি পরমাণুর মূল্যের গর্ব প্রয়োজন। সহীহ মুসলিমের ২৬৭ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহর এই রহমত, সৎকর্মের আকারে, বাস্তবে একটি আলো যা তারা পরকালে একটি পথনির্দেশক আলো পেতে চাইলে এই দুনিয়ায় সংগ্রহ করতে হবে। যদি কোনো মুসলমান গাফিলতিতে জীবনযাপন করে এবং পবিত্র কোরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত নেয়ামত ব্যবহার করে পৃথিবীতে এই নূর সংগ্রহ করা থেকে বিরত থাকে। তার উপর, তাহলে তারা পরকালে এই পথনির্দেশক আলো পাওয়ার আশা কিভাবে করতে পারে?

সকল মুসলমানই আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দাদের সাথে জান্নাতে বাস করতে চায়, যেমন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে। কিন্তু এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, কেবলমাত্র কর্ম ছাড়াই এই কামনা করলে তা বাস্তবে পরিণত হবে না, অন্যথায় সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতেন। সহজ কথায়, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার জন্য যত

বেশি চেষ্টা করা হবে , আখেরাতে তারা ততই তাঁর নিকটবর্তী হবে। যদি কেউ তার এই জগতের পরিবর্তে অন্য পথ বেছে নেয় , তবে তারা তার সাথে পরের পৃথিবীতে কীভাবে শেষ হতে পারে?

উপরন্তু, ইসলামিক শিক্ষাগুলি স্পষ্ট করে যে, যারা তাদের মৌখিকভাবে বিশ্বাসের ঘোষণাকে কর্মের সাথে সমর্থন করেছিল তাদের জান্নাত দেওয়া হবে। তাই কাউকে অন্যথায় বিশ্বাস করার জন্য কখনই বোকা বানানো উচিত নয়। যে ব্যক্তি তাদের বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণাকে কার্যত সমর্থন করতে ব্যর্থ হয় তার বিশ্বাস ছাড়াই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার বিষয়ে আরও বেশি উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত, কারণ বিশ্বাস একটি গাছের মতো যাকে কর্মের মাধ্যমে পুষ্ট করা উচিত, অন্যথায় এটি মারা যেতে পারে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 32:

"যাদেরকে ফেরেশতারা মৃত্যুবরণ করে, [তারা] উত্তম ও পবিত্র; [ফেরেশতারা] বলবে, "তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা যা করতে তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ কর।"

জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হল শারীরিকভাবে মহান আল্লাহকে পর্যবেক্ষণ করা, যা সহীহ বুখারি, 7436 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। কোনো মুসলমান যদি এই অকল্পনীয় নিয়ামত পেতে চায় তবে তাদের অবশ্যই একটি হাদিসে উল্লেখিত শ্রেষ্ঠত্বের স্তর অর্জনের জন্য কার্যত চেষ্টা করতে হবে। সহীহ মুসলিম, 99 নম্বরে পাওয়া যায়। এটি হল যখন একজন ব্যক্তি কাজ করে, যেমন নামায, যেন তারা তাদের উপেক্ষা করে মহান আল্লাহকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে। এই মনোভাব মহান আল্লাহর প্রতি একজনের অবিচল ও আন্তরিক আনুগত্য নিশ্চিত করে। আশা করা যায় যে, যে ঈমানের এই স্তরের জন্য চেষ্টা করবে সে পরকালে মহান আল্লাহকে শারীরিকভাবে পালন করার বরকত পাবে।

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট :
https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক:
https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন:
https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe